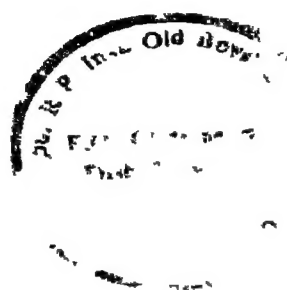




ছোটদের রাজনীতি

নীহারকুমার সরকার



পুথিখর

২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা

পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ
জানুয়ারী ১৯৫৫
কাম এক টাকা

২৫ রাযবাগান ষ্ট্রিট, কলিকাতা, ইকনমিক প্রেসে রত্নেশ্বর বসু কর্তৃক
মুদ্রিত ও ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা, পুথিঘরের পক্ষ
হইতে স্রবোধ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীমান অজিতকুমার ঘোষকে—

স্নেহের খোকন, তুমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলে, সোস্তালিজম কি !
তারই উত্তরে এ-বইখানা লিখে তোমাকে দিলাম । ইতি—

নীহাবদা

দুচৌপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ ক্যাপিটালিজম্ বা পুঁজিবাদ	৫
২ ইম্পেরিয়ালিজম্ বা সাম্রাজ্যবাদ	১৬
৩ ক্যাসিজম্ বা ক্যাসিবাদ	২৩
৪ সোশ্যালিজম্ বা সমাজতন্ত্রবাদ	৩৭
৫ সোশ্যালিজম্ ও কমুনিজম্ বা সাম্যবাদ	৫৭
৬ ডেমোক্রাসী বা গণতন্ত্র	৬৪
৭ পৃথিবীর রাজনীতি	৬৯

[এক]

ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ

ক্যাপিটালিজম ২—

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাতে ঘুমোতে যাওয়া অবধি, আমবা কত হাজার হাজার বকমের জিনিস-পত্র ব্যবহার কবি তা কখনো হিসাব ক'বে দেখেছ কি ? যেমন, সকালে ঘুম থেকে উঠেই টুথ-ব্রাশ, টুথ-পেই, তোয়ালে, সাবান চাই। তাবপব, চা খাবার জন্তে চাই চা, চিনি, দুধ, পেয়লা, পিবিচ, মাখন, ক্রটি ইত্যাদি। তাবপব, প'ডতে বসবে তাব জন্ত বই, খাতা, কাগজ, কলম, চেয়ার, টেবিল চাই। ইস্কুলে যাবে তাব জন্ত কাপড়-চোপড়, সাইকেল বা মোটর চাই। এই বকম ক'বে সব বকম কাজের জন্তই আমাদের নানাবকম জিনিস-পত্রের দরকার হয়। এই সব জিনিস-পত্র কোথেকে আসে জান ? বাজারে দোকানদারের কাছ থেকে তোমার বাবা কিনে নিয়ে আসেন। দোকানদাররা আবার কারখানা থেকে, চাষীদের কাছ থেকে, খনির মালিকদের কাছ থেকে এই সব জিনিস-পত্র কিনে আমাদের কাছে বিক্রী করে। কারখানার মালিকরা, চাষীরা ও খনির মালিকরা তাদের কল-কারখানা খাটিয়ে, জায়গা-জমি চাষ

ক'রে খনি থেকে নানাবকম জিনিস তুলে কুলি-মজুরদের দিয়ে এই সব জিনিস তৈরী কবায়। এই সব জিনিস-পত্র তৈরী কবার যে যন্ত্রপাতি, কল-কাবখানা, জমি-জায়গা, খনি ইত্যাদি ঐ গুলিকে আমরা বলব “উৎপাদন-যন্ত্র” (means of production) কাবণ এগুলোর সাহায্যে আমাদের দরকাবী জিনিস-পত্র “উৎপাদিত” অর্থাৎ তৈরী হয়। আব এই সব জিনিস-পত্র যা আমরা ব্যবহার করি তা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় বলে, তাকে বলব “পণ্য” (commodity).

এক সোভিয়েট দেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য :সকল দেশে এই উৎপাদন-যন্ত্রগুলো অর্থাৎ খনি, কলকাবখানা, জায়গা-জমি-এসব, লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অর্থাৎ যাব এইকপ কোন উৎপাদন-যন্ত্র আছে, শুধু সে একাই তাব মালিক, সমাজে অন্য কেউ তার এই উৎপাদন-যন্ত্রের বিষয়ে কোন হাত দিতে পাবে না। যেমন, কাবো যদি একখণ্ড জমি থাকে, বা একটা কারখানা থাকে, তবে সে জমি চাষ কবা বা না করা তার ইচ্ছা; সে কাবখানা চালু কবা বা বন্ধ রাখা সম্পূর্ণ তার মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর কবে। আবার সেই জমিতে যদি কোন ফসল হয় বা কারখানায় যদি কোন জিনিস তৈরী হয় তবে সেই ফসল বা সেই জিনিস যার জমি বা যার কল তারই হবে। ক্যাপিটালিজমের গোড়ার কথাই হ'ল এই—উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার।

যাদের এই উৎপাদন-যন্ত্রে অধিকার থাকে তারা এগুলো সাধারণতঃ ফেলে রাখে না, সেগুলো খাটিয়ে নানারকম জিনিস-পত্র তৈরী করে। কেন তৈরী কবে? কেননা তৈরী ক'রে বাজারে বিক্রী ক'রে এদের যথেষ্ট লাভ হয়। এই লাভের লোভেই উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকরা উৎপাদন-যন্ত্র খাটিয়ে জিনিস-পত্র তৈরী করায়। এই সব জিনিস-পত্র বা পণ্য আমাদের অভাব মেটায়, আমাদের দবকারে লাগে, এগুলো না পেলে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয়, এমন কি বেঁচে থাকতেও পাবি না। কিন্তু সে সব কথা উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকেরা ভাবে না। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য লাভ বা 'মুনাকা' (profit), যতক্ষণ লাভ হবে, ততক্ষণ অবধি তারা পণ্য উৎপাদন কবে বাজারে বিক্রী করবে। যখন লাভ বন্ধ হবে, তখনি পণ্য উৎপাদনও তাবা বন্ধ করবে, তাতে লোকেব অসুবিধাই হোক, আর তাবা না খেতে পেয়েই মকক, সে-দিকে তাবা জ্রক্ষেপও করবে না। কাজেই লাভ করবার জন্তেই এই সব পণ্য ক্যাপিটালিষ্ট সমাজে তৈরী করা হয়, লাভই ক্যাপিটালিজমের প্রধান কথা, এই সকল পণ্য যে মানুষের ভাল ভাবে বেঁচে থাকবার জন্ত দরকার সে কথাই বড় কথা নয়।

মোটামুটি ভাবে ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের একটা সংজ্ঞা আমরা এখন দিতে পাবি। যে সমাজে উৎপাদন যন্ত্রগুলি ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে এবং যেখানে একমাত্র লাভের

জন্মই পণ্য তৈরী হয়, সেই সমাজকে আমরা ক্যাপিটালিষ্ট সমাজ বলতে পারি।

উৎপাদন-যন্ত্র যখন এইরূপ ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে, এবং ব্যক্তিগত লাভেব জন্ম যখন তা দিয়ে পণ্য তৈরী হয়, তখন, সেই উৎপাদন-যন্ত্রগুলোকে বলা হয় পুঁজি বা ক্যাপিটাল। যেমন, কারখানার মালিকেব “পুঁজি” হ’ল তাব কাবখানা। জমিদারের পুঁজি হ’ল তার জমি-জমা। সুদ-খোরের বা ব্যাঙ্কারের পুঁজি হ’ল তার টাকা। আব খনির মালিকেব পুঁজি হ’ল তাব খনি। এই সব পুঁজির মূল্য আবাব টাকায় হিসাব করা যায়। যেমন, খনিব মূল্য যদি হয় দশ হাজার টাকা, তবে খনিব মালিকের দশ হাজার টাকাব পুঁজি আছে বলা হয়।

ক্যাপিটালিজ্‌মের ফল :

আগেই বলেছি লাভেব জন্ম উৎপাদন-যন্ত্রেব মালিকবা তাদের ক্যাপিটাল বা পুঁজি খাটায়। সমাজেব যাবা গবীব-লোক তারা পেটের দায়ে বাধ্য হ’য়ে কল-কাবখানায়, খনিতে, জমিতে কাজ খুঁজতে আসে। কাবণ তাদের টাকা-কড়ি নেই, জমি-জমা নেই, ‘উৎপাদন-যন্ত্র’ কিছুমাত্র নিজেদের হাতে নেই, একমাত্র নিজেদের দেহ-ছাড়া তাদের আর কোন পুঁজি নেই যা খাটিয়ে তারা কিছু আয় ক’রতে পাবে। তাই তারা তাদের একমাত্র সম্বল শরীর খাটিয়ে বাঁচে।

এরাই মজুর , এদের তাই বলে ‘সর্বস্বাধীন’, বা স্বশ্রমজীবী’ (proletariat : প্রোলিটারিয়েট) ক্যাপিটালিষ্টরা তাদের কাছ থেকে তাদের এই পরিশ্রম করার শক্তি কিনে নেয় এবং তা খাটিয়ে যথেষ্ট পবিমাণে পণ্য তৈরী ক’বে বাজারে বিক্রী কবে। বাজারে পণ্য বিক্রী ক’বে মালিকবা যা টাকা পায়, তা থেকে মজুরদের মাইনে হিসাবে কিছু দেয়, এবং অন্যান্য (যেমন কাঁচামালের দাম, ব্যাক্তের কাছ থেকে ধার-কবা টাকার সুদ ইত্যাদি) খবচপত্র বাদ দেয় , তাবপব যা বাকী থাকে তাই হ’ল ক্যাপিটালিষ্টের লাভ ।

ক্যাপিটালিষ্টের যা লাভ হয় তাব কতকটা সে নিজের, তাব ছেলে-মেয়ের ও পবিবাবেব অন্যান্য সকলের জন্ত খবচ কবে এবং বাকীটা আবার পুঁজি হিসাবে ব্যবসা-পত্রেই খাটায়। এমনি ভাবে তাব কল-কাবখানা বড হয়, পুঁজি বেড়ে যেতে থাকে , এবং যতই তার পুঁজি বেড়ে যায় ততই আবার তাব লাভের পবিমাণও বেড়ে যেতে থাকে। এমনি ভাবে লাভ বাড়তে পুঁজিও বাড়ে, এবং পুঁজি বাড়ায় লাভ আরও বেড়ে যেতে থাকে। এই বর্দ্ধিত পুঁজি খাটাবার দবকাবও হয় তাব খুব, এবং সুযোগও পায় সে যথেষ্ট। বাজারে অন্যান্য অনেক ক্যাপিটালিষ্ট থাকে, যাদের সঙ্গে পণ্য বিক্রী করার জন্ত তাকে প্রতিযোগিতা ক’বতে হয়। এই প্রতিযোগিতায় সে-ই জিতে, যে সব-চেয়ে কম দামে জিনিস বিক্রী ক’রতে পারে। এই জন্ত সব ক্যাপিটালিষ্টরা

চেপ্টা করে যাতে খুব কম খরচায় খুব বেশী মাল তৈরী ক'রতে পারে। তার জন্তু তারা বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে নানা রকম নূতন নূতন কল ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার কবিয়ে তা পণ্য তৈরীর কাজে লাগায়। উদ্দেশ্য এই যে, এই সব যন্ত্রপাতিব সাহায্যে শ্রমিকদের কাছ থেকে খুব কম সময়ে বেশী কাজ আদায় কবিয়ে নিয়ে, খুব সস্তায় পণ্য তৈরী করা। পণ্য সস্তায় উৎপন্ন হ'লে বিক্রী কবাও যায় সস্তায় এবং সস্তা দরে পণ্য বিক্রী ক'বলে বিক্রীও হয় অনেক বেশী। কাবণ সবাই যাব জিনিসেব দাম কম, তার কাছ থেকেই কেনে। আব বিক্রী বেশী হ'লে সাধাবণতঃ লাভও বেশী হয়। এই জন্তু ক্যাপিটালিষ্টবা সব সময় চেপ্টা কবে তাদের পুঁজি বাড়াতে, কাবণ পুঁজি বাড়ালেই তাদের লাভ বাড়ে। দেখতে দেখতে ছোট কারখানা বড় কারখানা হ'য়ে পড়ে, নূতন নূতন কল-কজা বসে, যেখানে একশো মজুব কাজ ক'বত, সেখানে হাজার মজুর খাটতে থাকে। জিনিসপত্র তৈরীর নূতন নূতন কৌশল আবিষ্কার হয়।

একদিকে যেমন ক্যাপিটালিষ্টদের পুঁজি, ধনসম্পত্তি, বেড়ে যেতে থাকে, অন্ডদিকে আবার সমাজে দাবিদ্রাও বেড়ে যেতে থাকে। যাদের পুঁজি অল্প, তারা বড় পুঁজিওয়ালাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে সর্ব্বস্বাস্তু হ'য়ে পড়ে এবং মজুরদের দলে ভিড়ে যায়। এমনি ভাবে শ্রমিকদের দল বেড়ে যেতে থাকে। অন্ডদিকে কলকজা আবিষ্কার হওয়ায়

কলেই সব কাজ ক'রে দেয়, শ্রমিকদের আর দরকার হয় না বেশী। কাজেই শ্রমিকরা যেমন সংখ্যায় বেড়ে যায়, তেমনি তাদের কাজও কমে যায়। এইজন্য শ্রমিকবা যা পায় সেই মাইনেতেই কাজ করতে বাজী হয়। ক্যাপিটালিষ্টরাও সুবিধা বুঝে খুব কম মাইনে দেবাব চেষ্টা কবে। কাবণ মাইনে যত কম দেবে, তত তাদের পণ্য তৈবীর খবচ কম হবে এবং ততই লাভ বেশী হবে। সমাজে সেই জন অল্প কয়েক-জন লোক খুব ধনী হ'য়ে ওঠে, আব বাকী সব লোক তাদের তুলনায় ক্রমেই গবীব হ'য়ে পডতে থাকে। এমনি ভাবে সমাজে ক্যাপিটালিজম্ গোটাকয়েক লোককে ধনী ক'বে বেশীর ভাগ লোককে গরীব ক'বে দিতে থাকে। এই হ'ল ক্যাপিটালিজমের প্রথম ফল।

পুঁজিবাদ শুধু যে শ্রমিকদের আয় কমিয়ে দিয়ে তাদের গরীব ক'বে দেয় তা নয়, সময় সময় তাদের আয়েব পথ একেবারে বন্ধ কবে দিয়ে হাজারে হাজারে তাদের ভিক্ষুকে পরিণত কবে। আমবা দেখেছি, বাজাবে জিনিসপত্র বিক্রী হ'লে তবে ক্যাপিটালিষ্ট তার লাভ আদায় ক'রতে পাবে। কিন্তু বাজাবে পণ্য কেনে কাবা ? কিছু পণ্য ক্যাপিটালিষ্টরা নিজেবাই কেনে। আব বেশীর ভাগ কেনে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেবা। কিন্তু এদের আয় যখন কমে যায়, তখন এবা আর সব জিনিস কিনতে পারে না। তার ফলে পণ্য বাজারে বিক্রী না হ'য়ে পড়ে থাকে। দোকানে,

কারখানার গুদামে পণ্য বোঝাই হ'য়ে থাকে। কিন্তু ক্রেতাদের পকেটে পয়সা না থাকায় ঐ সব জিনিসপত্র আর বিক্রী হয় না। পণ্য বিক্রী না হওয়ায় ক্যাপিটালিষ্টদের লাভ আব হয় না ববং লোকসান হ'তে থাকে। তখন ক্যাপিটালিষ্ট বাধ্য হ'য়ে তার কাবখানা বন্ধ ক'বে দেয়। কারণ বাজারেই যখন জিনিসপত্র অবিক্রীত অবস্থায় বোঝাই হ'য়ে বয়েছে, তখন আরও পণ্য তৈরী ক'বে লাভ কি? কাবখানাব পব কাবখানা বন্ধ হ'য়ে যায়, ব্যাঙ্ক ফেলু পড়তে থাকে, হাজাব হাজাব শ্রমিক বেকাব হ'য়ে যায়। ক্যাপিটালিজমের এই দুর্দশাকে বলা হয় “ব্যবসা-সঙ্কট”। ব্যবসা-সঙ্কটের সময় শ্রমিকদের দুর্দশাব একশেষ হয়। ছেলেপুলে নিয়ে, চেয়েচিন্তে অতি কষ্টে আধপেটা খেয়ে, কোনদিন না খেয়ে তাদের দিন কাটে। এই শতাব্দীতেই তিনবার এইরূপ ব্যবসা-সঙ্কট হ'য়ে গেছে। এ অবধি শেষবাবের ব্যবসা-সঙ্কট হ'য়েছিল ১৯৩০ সালে। সে-বাবের ব্যবসা-সঙ্কটে একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই ১ কোটি ৩০ লক্ষ শ্রমিক বেকাব হ'য়ে গিয়েছিল। তাবা যে কি বকম ভাবে বেঁচে থাকত, তাব সঠিক কোন হিসেব পাওয়া যেত না। তাদের ছোট ছেলে-মেয়েরা দোকানের ও গুদামের আশেপাশে ঘুরে বেডাত। ডকের গুদামে নানা রকম খাওয়াব, ফলমূল মজুত হ'য়ে থাকত। যখনই এখান থেকে পচে যাওয়ার জন্ত বা খারাপ হ'য়ে যাবার জন্ত কোন কিছু বাইরে ফেলে দেওয়া

হ'ত, তখনি বাইবের ছেলে-মেয়েবা কুকুরের মত কাডাকাডি ক'রে সেই খাবার বা ফল-মূল খেয়ে নিত। (চার্লি চ্যাপলিনেব “মডার্ন টাইমস্” নামক ছবিতে*এই বকম মৰ্মাস্তিক দৃশ্য তোমবা দেখতে পাবে।) এই রকম, একদিকে যেমন যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্ৰব্য ঞ্চদামে ব'সে পচ'ত, অন্মদিকে লোকে ছেলে পুলে নিয়ে না খেয়ে মরত, একদিকে যেমন ঞ্চদামে পোষাক-পরিচ্ছদ বোঝাই হ'য়ে থাকত, অন্মদিকে লক্ষ লক্ষ লোক শীতে কষ্ট পেত। শিশুবা শীতের বাতে ঠাণ্ডা হ'য়ে জমে যেত। বড বড বাড়ী খালি পড়ে থাকত, অথচ লোকে আশ্রয় শূন্ম হ'য়ে রাস্তায় বাস্তায় ঘুরে বেডাত। এমন কি ক্যাপিটালিষ্টবা বাজার নষ্ট হ'য়ে যাবে ব'লে, পণ্য কম দামে বিক্রী না ক'রে বা বিনা পয়সায় পণ্য বিলিষে না দিষে, সব সমুদ্রে ফেলে দিত বা পুডিয়ে ফেল'ত। এই রকম প্রাচুর্য্য ও দারিদ্ৰ্য্য ক্যাপিটালিজমেব কুপায় পাশাপাশি অবস্থান করে। এই ব্যবসা-সঙ্কট ও লোকদের বেকার ক'বে দেওয়া হ'ল—ক্যাপিটালিজমেব দ্বিতীয় ফল! ক্যাপিটালিষ্টবা এই ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্ম বাড়তি জিনিসপত্ৰ নষ্ট ক'রে দেয়। উৎপাদন-যন্ত্ৰের খানিকটা ধ্বংস ক'রে ফেলে এবং আরও বেশী ক'রে শ্রমিকদের কম মাইনে দিষে, বেশী ক'রে খাটাবার চেষ্টা করে। এব ফলে উৎপাদন-যন্ত্ৰ খাটিযে কিছু দিনেব জন্ম তাদেব আবার বেশ লাভ হ'তে থাকে। কিন্তু লাভ বেশ জেঁকে উঠবার আগেই

আবার ব্যবসা-সঙ্কট আবহু হয। এই রকম কিছুদিন অন্তর অন্তর ব্যবসা-সঙ্কট ক্যাপিটালিজমের একটা বিশেষ বীতি। •

ক্যাপিটালিজমের তৃতীয় ফল হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। পুঁজিবাদী কল মালিকেরা যে পণ্য তৈরী ক'রে যত বেশী লাভ পাবে, সেই পণ্য তত বেশী তৈরী করবে। কিন্তু এই লাভ আদায় ক'রতে হ'লে তাকে উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রী ক'রতে হবে। সুতরাং বাজারে যে জিনিসেব বিক্রী নেই, সে জিনিস মালিকেবা কিছুতেই তৈরী ক'রবে না। সে জিনিস খুব আবশ্যকীয় হ'তে পারে, এমন কি সে জিনিস না পেলে মানুষ মরে যাবে এমনও হ'তে পারে, তবু কিন্তু পুঁজিবাদীরা তা তৈরী ক'রবে না, যদি তা বাজারে বিক্রী ক'বে তা থেকে তাদের কিছু লাভ না হয়। এদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমেই গরীব হ'য়ে পড়ে। তাই তাবা তাদের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র বেশী দাম দিয়ে কিনতে পাবে না। অপবদিকে ধনীদেব হাতে যথেষ্ট পয়সা থাকায় তারা তাদের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র কিনতে ত পারেই উপরন্তু নানা-প্রকার বিলাসিতাব জিনিসপত্রের জন্তও বিশেষ ক'বে তাগিদ দিতে থাকে। ফলে খাটুজব্বা, কাপড় ইত্যাদি বাঁচবাব পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে জিনিসগুলো, সেগুলো যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী না ক'রে, পুঁজিবাদীরা মোটর গাড়ী, সুন্দর বাড়ী,

বেডিও প্রভৃতি বিলাসিতার জিনিসপত্র তৈরী ক'বায়। কারণ এগুলো ধনীদেব কাছে বেশ চড়া দামে বিক্রী হবে। তাতে তাবা মোটা কাপড় ও ঋতুভব্য তৈরী চাইতে অনেক বেশী লাভ ক'বতে পাবে। পুঁজিবাদী-সমাজে তাই উৎপাদন ক্ষমতা এমন ভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে মানুষেব সবচেয়ে আগে যে জিনিসগুলো দরকার সেগুলো তৈরী না হ'য়ে, ধনীদেব বিলাসিতার খোবাক যোগাবার জন্য জিনিসপত্র তৈরী হয়। ফলে একদিকে কোটী কোটী লোক বৃদ্ধীকৃত ও অর্জনগ্ন থেকে যায় এবং অন্যদিকে বিলাসিতার চূড়ান্ত ব্যবস্থা ক'বা হয়। একটা উদাবণ দিচ্ছি :—১৯৩১-৩৩ সালে ভয়ঙ্কর ব্যবসা-সঙ্কট হ'য়েছিল বলেছি। তাতে সমস্ত পৃথিবীতে কোটী কোটী লোক বেকাব হ'য়ে গিয়েছিল। এই সময়ে বিলাতেব অষ্টিন মোটরকাব কোম্পানী গর্বেব সঙ্গে তাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী লাভ ঘোষণা ক'বে। কাবণ ধনীদেব হাতে তখন বিস্তর টাকা। ব্যবসায়ে সে টাকা তাবা খাটাতে পাচ্ছিল না—অন্যান্য ব্যবসায়ে লাভ কমে গেছে বলে। তাই মোটরগাড়ী কিনে ও অন্যান্য বিলাসিতায় তারা সে টাকাটা খরচ ক'বেছিল। আর অষ্টিন কোম্পানীও মোটরগাড়ী তৈরী ক'বেছিল খুব।

ক্যাপিটালিজমেব চতুর্থ ফল হচ্ছে যুদ্ধ। যুদ্ধ কেন হয়, তার কারণ আমবা এব পরেব অধ্যায়ে এখন আলোচনা ক'রব।

[দুই]

ইম্পেরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ

আমরা দেখেছি পুঁজিবাদের একটা বিশেষ প্রকৃতি হ'ল খুব দ্রুত পুঁজিব পবিমাণ বেড়ে যাওয়া। পুঁজিব পবিমাণ বেড়ে যাওয়াতে নতুন নতুন কল-কক্সা নতুন নতুন উৎপাদন-কৌশল আবিষ্কার হয়, এবং এব ফলে সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে পণ্য তৈরী হ'তে থাকে। কিন্তু ক্যাপিটালিষ্টেব আয় যে বকম পবিমাণে বাড়ে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত লোকদেব আয় সে বকম বাড়ে না। কাজেই পুঁজি বেড়ে গিয়ে অনেক বেশী বেশী জিনিসপত্র তৈরী হয় বটে, কিন্তু লোকেব সেই সব জিনিসপত্র কিনবাব ক্ষমতা তেমন বাড়ে না। এব ফলে, আমবা দেখেছি, ব্যবসা-সঙ্কট উপস্থিত হয়। অর্থাৎ বাজাব অবিক্রীত পণ্যে বোঝাই হ'য়ে যায়। দোকানে, দোকানে, গুদামে, গুদামে জিনিসপত্র বোঝাই হ'য়ে প'ড়ে থাকে। হাজাব অভাব থাকলেও, হাজাব ক্ষুধা থাকলেও খাদ্য ও ক্ষুধিতেব মধ্যে টাকায় প্রচীত ব্যবধান সৃষ্টি ক'বে রাখে। এদিকে এই সব পণ্য বিক্রী না হ'লে ক্যাপিটালিষ্টেদেব লাভ আদায় কবা হয় না। নিজেদের দেশের বাজারে যখন আর এই সব পণ্য

বিক্রী হয় না, বাধ্য হয়েই পণ্য বিক্রী করার জন্য ক্যাপিটালিষ্টরা বাজারের খোঁজ বিদেশে বার হ'য়ে পড়ে। বাজারের খোঁজ ক'বতে ক'রতে এরা কি রকম দেশে এসে হাজির হয়? যে দেশে ক্যাপিটালিষ্ট প্রথায় জিনিসপত্র তৈরী হয়, সে-রকম দেশে এসে তাদের কোন লাভ হয় না। কারণ এ-সব দেশগুলোতে তাদের দেশের মতই অবিক্রীত পণ্যে বাজার বোঝাই হ'য়ে থাকে। সেখানে পণ্য বিক্রী করার কোন আশা থাকে না। কাজেই এরা, সেই সব দেশে এসে ভীড় কবে, যে সব দেশে এখনও ক্যাপিটালিষ্ট প্রথা যথেষ্ট অঁকড়ে ধরেনি। এই সব পেছনে-পড়ে-থাকা অ-ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোতে ক্যাপিটালিষ্টরা তখন তাদের অবিক্রীত পণ্য নিয়ে হাজির কবে এবং সেখানে সব বিক্রী করার চেষ্টা ক'রতে থাকে। সব ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোই যে যার পণ্য নিয়ে এসে এদের কাছে বিক্রী করতে চায়। এই নিয়ে বিভিন্ন দেশের ক্যাপিটালিষ্টদের ভেতর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, ঝগড়াঝাঁটি হ'তে থাকে। তখন তারা এই দেশগুলোর গভর্নমেন্ট অধিকার কবাব চেষ্টা ক'রতে থাকে। কারণ গভর্নমেন্ট যে জাতির ক্যাপিটালিষ্টদের হাতে থাকবে, সে জাতির ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব সুবিধে হবে; এবং এই গভর্নমেন্টের ক্ষমতা লাগিয়ে অন্য দেশের ক্যাপিটালিষ্টদের যথেষ্ট নাস্তানাবুদ করা যাবে। ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলো তখন

যুদ্ধ ক'বে এই সব অ-ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোকে হস্তগত ক'রে নেয়। এই রকম ভাবে কোন পেছনে-পড়ে-থাকা, অ-ক্যাপিটালিষ্ট দেশ যখন কোন ক্যাপিটালিষ্ট দেশের হাতে চ'লে যায়, তখন এই অধিকৃত পেছনে-পড়ে-থাকা দেশকে বলা হয়, ঐ অধিকারী ক্যাপিটালিষ্ট দেশের “কলোনী” বা “উপনিবেশ।”

সব ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোরই ক্যাপিটাল বেড়ে গিয়ে এমন একটা অবস্থায় এসে প'ড়তে হয়, যখন তাদের বাজারে আর তাদের পণ্য বিক্রী করা সম্ভব হয় না, তখন বাধ্য হয়েই তাদের কলোনীর খোঁজে বেরতে হয়। ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোর বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়াই হল কলোনীর প্রথম আবশ্যকতা। এ-ছাড়াও কলোনীর ক্যাপিটালিষ্ট দেশের জন্য অগ্ন্যান্ত কতকগুলো প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ, কলোনী থাকলে ক্যাপিটালিষ্ট দেশের কাবখানাগুলোর জন্য খুব সস্তা দামে এখান থেকে কাঁচা-মাল পাওয়া যায়। সস্তা-দামে কাঁচা-মাল পেলে, পণ্য তৈরীর খরচাও কম হয়, এবং পণ্য তৈরীর খরচা কম হলে পণ্যের দামও কম করা যায়। আর দাম কম হ'লে বিক্রী বেশী হয়, এবং বিক্রী বেশী হ'লে লাভও বেশী হয়। দ্বিতীয়তঃ, ক্যাপিটালিষ্ট দেশের মজুবদের জন্য সস্তা-দামে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। তার ফলে মজুবদের মাইনে কম ক'রে দেওয়া যায়। কারণ খাবার জিনিস-পত্রের দাম বেশী

হ'লে, শ্রমিকদের মাইনেও বাড়াতে হয়, তা না হলে না খেয়ে মজুররা মারা যায়। আর খাবার-দাবার সস্তা হলে মজুরদের মাইনেও কম কবে দেওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, দেশে ক্যাপিটাল খুব বেড়ে গেলে, নূতন ক্যাপিটাল খাটাবার আব সুবিধে থাকে না। নূতন কোন কারখানা খুললে তাতে বেশী লাভ হয় না। ক্যাপিটালের পরিমাণ বেশী হ'য়ে গেলে, লাভের হারও কমে যেতে থাকে। কাজেই, দেশে ক্যাপিটাল খাটান আব লাভজনক হয় না। তখন ক্যাপিটাল খাটাবার জন্য ক্যাপিটালিষ্টবা জায়গা খুঁজতে থাকে। বস্তুতঃ তাদের অধিকারে যে সব কলোনী আছে, সেই সব কলোনীতেই তাবা তাদের এই বাড়তি বা উদ্বৃত্ত ক্যাপিটাল খাটাবাব সবচেয়ে নিবাপদ ও ভাল জায়গা পায়। কাবণ এখানে তাদেরই গভর্নমেন্ট তার সমস্ত সৈন্ত-সামন্ত নিয়ে তাদের ক্যাপিটাল রক্ষা ক'ববে। অন্য কোন জাতিব কলোনীতে সে সুবিধা নাও পেতে পারে। উদ্বৃত্ত ক্যাপিটাল খাটানোব ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার কবা হ'ল কলোনীব তৃতীয় আবশ্যকতা। চতুর্থতঃ, কলোনী থাকলে ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোর বেকার সমস্যা একটু লাঘব হয়। ওদের দেশেব বেকার লোকেরা কলোনীতে গিয়ে নানা ভাবে যথেষ্ট আয় ক'বতে পারে। পঞ্চমতঃ, কলোনী থাকলে, দেশের শ্রমিকদেরও বেশ বশে রাখা যায়। কাবণ কলোনীতে পণ্য বিক্রী করে প্রচুর লাভ হয়।

এই লাভের এক অংশ দিয়ে শ্রমিকদের হাতে রাখা যায়। এর ফলে শ্রমিকরা ক্ষেপে গিয়ে দেশে কোন গোলমাল করে না বা বিপ্লব আনে না। এই সব কারণে ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোর কলোনীর খুব দরকার। কলোনী না পেলে উদ্ভূত পণ্য বিক্রী হয় না, উদ্ভূত মাল বিক্রী না হ'লে কল-কারখানা সব বন্ধ থাকে, কল-কারখানা বন্ধ থাকলে শ্রমিকরা বেকার থাকে, শ্রমিকবা বেকার থাকলে, আর খেতে না পেলে, রেগে গিয়ে বিপ্লব ক'বে ক্যাপিটালিষ্টদের হাত থেকে গভর্নমেন্ট কেড়ে নিয়ে নিজেদের গভর্নমেন্ট স্থাপন ক'বে ক্যাপিটালিষ্টদের ধ্বংস ক'রে দিতে পারে। কাজেই কলোনী না পেলে ক্যাপিটালিজম্ টিকতে পারে না।

তাহলে ইম্পেরিয়ালিজমের মোটামুটি একটা সংজ্ঞা আমরা এখন দিতে পারি। কোন ক্যাপিটালিষ্ট দেশ যখন উদ্ভূত মাল বিক্রীর জন্ত, উদ্ভূত ক্যাপিটাল খাটাবার জন্ত, সম্ভাব্য কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য কেনবাব জন্ত, কোন পেছনে-পড়ে থাকা, অ-ক্যাপিটালিষ্ট দেশ দখল ক'রে নেয়, তখন সেই দখলকারী দেশকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদী-দেশ; আর যে দেশ দখল ক'রে নেয়া হয়, সে দেশকে বলা হয় তার কলোনী।

সাম্রাজ্যবাদের প্রথম কাজই হ'ল কলোনীকে নিজের দেশের মালপত্র বিক্রী ক'রবার জন্ত বাজার হিসেবে ব্যবহার করা। কাজেই কলোনীর সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেন্ট কখনো

কলোনীতে এমন কোন পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী ক'রতে দিতে চায় না, যা তাদের দেশেও তৈরী হয়। এই জন্তে কলোনীতে খুব ভাল ক'রে বর্তমান যুগের বড় বড় কল-কাবখানা বসিয়ে জিনিসপত্র তৈরী ক'রবার ব্যবস্থা হয় না। তাদের শুধু খাচ্ছজব্য ও কাঁচামাল তৈরী ক'রতে উৎসাহ দেওয়া হয়, এবং ছোটোখাটো কল-কারখানা কিছু ক'রতে দেওয়া হয়। এব ফলে, এবং লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে, দেশের লোকের দুর্দশার একশেষ হয়। তাদের দারিদ্র্য ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। ব্রিটেন একটা সাম্রাজ্যবাদী দেশ আর ভারতবর্ষ তার একটা কলোনী। ভারতবর্ষের লোকদের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে, এ-কথা কত সত্যি।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী-দেশের ক্যাপিটালিষ্ট যে একটু নিশ্চিন্তে ব'সে কলোনীর লোকদের শোষণ ক'রবে, তার অবসরও তারা পায় না। যে-সব ক্যাপিটালিষ্টদেশগুলোর কলোনী নেই, আমরা আগেই দেখেছি, কলোনীর জন্ত তাবা কাতর হ'য়ে পড়ে, এবং ইম্পেরিয়ালিষ্টদের দ্বারা অধিকৃত কলোনীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে, আর ইম্পেরিয়ালিষ্টদের কাছ থেকে এই কলোনীগুলো কেড়ে নেবার জন্তে গোপনে গোপনে যোগাড-যন্ত্র ক'রতে থাকে। তারপর যখন তাদের যোগাড-যন্ত্র শেষ হ'য়ে যায়, তখন সুযোগ বুঝে, ইম্পেরিয়ালিষ্ট দেশগুলোর উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে। কলোনীওয়ালা ইম্পেরিয়ালিষ্ট দেশে ও কলোনী-হীন ক্যাপিটালিষ্ট দেশের ভেতরে তখন ভীষণ যুদ্ধ আবিস্ত হ'য়ে যায়। বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য নিয়ে দুই দেশের ক্যাপিটালিষ্টবাই মানুষ খুন ক'রবাব যন্ত্রপাতি ও কল-কৌশল আবিষ্কার করে, ও সে-গুলোব সাহায্যে লক্ষ লক্ষ লোকের এমন কি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের বধ ক'বে, তাদের নিবাপরাধ বক্তে সবুজ পৃথিবী লাল ক'রে দিয়ে নিজেদের লাভ ক'ববার প্রচণ্ড লোভ পূর্ণ ক'রতে চেষ্টা করে।

যুদ্ধ কিন্তু একবার হ'য়েই শেষ হ'য়ে যায় না। যে সব ক্যাপিটালিষ্ট দেশ যুদ্ধে হেবে যায়, তাদের কলোনীগুলো যাবা জিতে, তাবা নিয়ে নেয়। কিন্তু আমবা আগেই আলোচনা ক'বেছি—কলোনী না হ'লে ক্যাপিটালিজম বাঁচতে পারে না। তাই হেরে গেলেও এই সব হেবে-যাওয়া-দেশগুলোর কলোনীব দরকার দূর হয় না। কাজেই কিছু দিনেব ভেতরই তারা আবাব কলোনী-লাভের জন্যে উঠে-পড়ে লাগে। আবাব যুদ্ধ হয়। এমনভাবে চলতে থাকে যুদ্ধ ও কলোনীর ভাগাভাগি।

লাভের জন্য পণ্য তৈরী কবাই হ'ল ক্যাপিটালিজমের মূলমন্ত্র। এই লাভেব জন্য পণ্য তৈরী হয় বলেই জনসাধারণ ক্রমেই গরীব হ'য়ে পড়তে থাকে, আব ধনীদের পুঁজি বেড়ে যেতে থাকে। এর ফলে পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী হয়,

কিন্তু বিক্রী হয় না। বাজার পণ্যে বোঝাই হ'য়ে যায়, ব্যবসা-সঙ্কট ও বেকার-সমস্যা দেখা দেয়। তখন ক্যাপিটালিষ্টরা কলোনীর খোঁজে বেরোয়। কলোনীর খোঁজ পেলে সাম্রাজ্যবাদ জন্ম নেয়। সাম্রাজ্যবাদের ফলে আসে যুদ্ধ। কাজেই যুদ্ধের মূল কারণ হ'চ্ছে সেই উৎপাদনযন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ও লাভের জন্য পণ্য উৎপাদন। এই দুইটি জিনিস যেদিন নষ্ট কবা যাবে, সেদিন যুদ্ধবিগ্রহও আঁব থাকবে না। তা না হ'লে কিছুদিন অন্তর অন্তর যুদ্ধ হওয়া অনিবার্য।

[তিন]

ফ্যাসিজম্ বা ফ্যাসিবাদ

তোমবা হয়ত শুনে থাকবে এই মহাযুদ্ধের আগে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল অবধি আর একটা যুদ্ধ হ'য়েছিল। এই যুদ্ধ হ'য়েছিল প্রধানতঃ কলোনীওয়ালা ইংরাজ ও ফরাসীরা সঙ্গে কলোনী-হীন জার্মানীর। ইংরাজ ও ফরাসীরা জয়লাভ ক'রবে এই ভেবে ক্রশদেশ ও ইটালী কলোনীর আশায় তাদের দলে যোগ দেয়, এবং তুরস্ক যোগ দেয় জার্মানীর দলে। যুদ্ধের শেষের দিকে আমেরিকা এসে যোগ দিয়েছিল ইংরাজ ও ফরাসীদের দলে। যুদ্ধে জার্মানী হেরে যায়। তার সব কলোনীগুলো ইংরাজ ও

করাসীরা ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে নেষ। ইটালীর ভাগে বিশেষ কিছুই দেয় না; এবং রুশদেশে বিপ্লব হ'য়ে ক্যাপিটালিষ্টদের হাত থেকে ক্ষমতা শ্রমিকদের হাতে চলে যাওয়ায়, রুশদেশকে 'ভদ্র' ক্যাপিটালিষ্ট সমাজ থেকে বিভাভিত করা হয়। এইরূপে ইটালী ও জার্মানী প্রায় কলোনী-হীন দেশই থেকে যায়।

কিন্তু যুদ্ধের পর থেকেই সব ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোতে ভাঙ্গন লাগে। যুদ্ধের পবই আবস্ত হয় ব্যবসা-সঙ্কট। হাজারে হাজারে শ্রমিক বেকাব হ'য়ে পড়ে। কলোনী-ওয়াল ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলো কলোনী থাবায় অবস্থা কতকটা সামলে নেয়। কিন্তু কলোনী-হীন দেশগুলোর হৃদয়শার চরম হ'তে থাকে। ইটালীতে শ্রমিকরা ক্ষেপে গিয়ে কল-মালিকদের তাড়িয়ে দিয়ে কল-কারখানা অধিকার ক'রে বসে। শ্রমিকদেব এই আন্দোলন দেখে ক্যাপিটালিষ্টরা ঘাবড়ে যায়। তারা তখন শ্রমিকদেব জব্দ ক'বে নিজেদের সম্পত্তি বক্ষার জন্য উঠে-পড়ে লাগে। এই কাজের জন্য একজন উপযুক্ত লোকের সন্ধানও তারা পায়। তার নাম মুসোলিনী। মুসোলিনী আগে শ্রমিকদেরই একজন নেতা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে ক্যাপিটালিষ্টদের পক্ষে গিয়ে নিজে যুদ্ধে যোগ দেয় এবং শ্রমিকদেরও যুদ্ধে যোগ দিতে বলে। এর ফলে শ্রমিক দল থেকে তাকে ভাড়িয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধ থেকে এসে কি ক'রবে সে

ভাবছিল, এমন সময় শ্রমিকদের আক্রোশ থেকে ক্যাপিটালিষ্টদের রক্ষার ভার তাব ওপরে পড়ে। সে তখন শ্রমিকদের জব্দ করাব জ্ঞাত্য একটা দল তৈরী করে। এই দলের নাম হ'ল “ফ্যাসিষ্ট” দল। দেশের সকল ধনীরা এই দলকে সাহায্য ক'বতে থাকে। এর ফলে কিছু দিনের ভেতবই ফ্যাসিষ্ট-দল বেশ শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে। কিন্তু শ্রমিকবা এই ফ্যাসিষ্ট-দলকে সাযেস্তা ক'ববার জ্ঞাত্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'বতে পাবল না। তাদের নেতাবা নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখার জ্ঞাত্য শ্রমিকদের একসঙ্গে মিলিত ক'রে ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ ক'রল না। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হ'য় নিজেদের ভেতব গোলমাল ক'রেই তারা তাদের শক্তি ক্ষয় ক'রল। ফলে ফ্যাসিষ্টরা অনাযাসে শ্রমিকদের পরাজিত ক'রে দিল। ফ্যাক্টবী থেকে শ্রমিকদের বিভাডিত ক'বে দিল, শ্রমিকদের দলগুলোকে জোর ক'রে ভেঙ্গে দিল, তাদের শ্রমিক-সঙ্ঘ বা ট্রেড্-ইউনিয়নগুলোও ভেঙ্গে দিল এবং শ্রমিক নেতাদের মেরে ফেল্ল, কাউকে জেলে পুরে দিল, কেউ বা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল। এইরূপে অত্যন্ত নৃসংশতার সঙ্গে শ্রমিক-আন্দোলনকে পরাজিত ক'রে, তারা ধনী-শ্রেণীর আশীর্বাদ লাভ ক'রল এবং ধনী-শ্রেণীব সম্পত্তি রক্ষার পাহারাদাব হিসেবে ধনীরা তাদের হাতে দেশের গভর্নমেন্ট তুলে দিল। মুসোলিনী ফ্যাসিষ্টদের নেতাদের নিয়ে “ফ্যাসিষ্ট গ্রাণ্ড্ কাউন্সিল্” নামে

এক বৈঠক রচনা ক'রে তাদের সাহায্যে দেশের একচ্ছত্র শাসক হ'য়ে গেল।

শ্রমিক-আন্দোলন যাতে আবার মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে, এবং কৃষকদের ভেতবও যাতে অসন্তোষ বেড়ে না যায়, তাব জন্তু তাদের কল মালিকদের ও জমিদারদের আওতায় কতকগুলো সজ্জ ক'বে তাব ভিতব ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল। এই সজ্জগুলোর নাম দেওয়া হ'ল “কবপোরেশন।” এই কবপোরেশন তৈরী ক'বে দেশ থেকে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে দূর ক'রবার একটা বন্দোবস্ত ক'বা হ'ল। শ্রমিক বিপ্লব থেকে ক্যাপিটালিষ্টদের বাঁচান হ'ল ফ্যাসিজমের প্রথম কাজ। কলোনীহীন দেশগুলোয় ফ্যাসিজমের দ্বিতীয় কাজ হ'ল কলোনী আদায় ক'বা। আমবা আগে দেখেছি, কলোনী না হ'লে ক্যাপিটালিজম বাঁচতে পারে না। কলোনী না পেলে ব্যবসা-সঙ্কট দেখা দেয়, হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হ'য়ে যায়, শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে। অবশেষে শ্রমিকরা ক্ষেপে গিয়ে ক্যাপিটালিষ্টদের হাত থেকে গভর্নমেন্ট কেড়ে নিয়ে উৎপাদন যন্ত্রগুলো তাদের নিজেদের ক'বে নেয়। এইজন্তু কলোনী না হ'লে ক্যাপিটালিজম বেশী দিন টিকতে পারে না। ফ্যাসিষ্টবা যদিও শ্রমিক আন্দোলন জোব ক'রে ভেঙ্গে দিল, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন যাব জন্তু সৃষ্টি হয় সেই মূল কারণ দূব ক'রতে পারল না। কারণ, সেই মূল কারণ হচ্ছে

ক্যাপিটালিজম্ এবং ফ্যাসিষ্টদের নৃষ্টি হয়েছিল শ্রমিকদের আক্রমণ থেকে ক্যাপিটালিজমকে বক্ষা কবাব জন্ত। কাজেই—শ্রমিক-কৃষকদের ক্রমেই গরীব হ'য়ে যাওয়ার জন্ত ব্যবসা-সঙ্কট, হাজাব হাজাব শ্রমিকদের বেকার হ'য়ে যাওয়া—ক্যাপিটালিজমের এই সব সমস্যা দূব করা গেল না। ফ্যাসিষ্টবা তখন কলোনীর খোঁজে বেরুল। আমরা আগেই দেখেছি, কলোনী থাকলে এই সব সমস্যা অন্ততঃ কিছু দিনের জন্ত সমাধান কবা যায়। কিন্তু গোলাকাব পৃথিবী তো আব সীমাহীন নয়, যে নূতন দেশ খুঁজলেই পাওয়া যাবে? কলোনীর উপযুক্ত যে সব দেশ ছিল, তা ইংরেজ ও ফরাসীবা ইতিমধ্যেই দখল ক'বে নিয়েছিল। কাজেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়া আর গতি নেই। সুতবাং “যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হও”—এই হ'ল ফ্যাসিষ্টদের মূলমন্ত্র। দেশকে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত কবাই হ'ল তাদের দ্বিতীয় কাজ।

এই উদ্দেশ্যে তাবা যুদ্ধের জয়গান গাইতে লুক ক'বল। ১৯১৪-১৯১৮ সালের যুদ্ধের নৃসংশতা ও বর্ষবতা দেখে লোকেব মনে যুদ্ধের প্রতি একটা আন্তরিক ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল। সেই ঘৃণার ভাব দূব ক'বে যুদ্ধের জন্ত তাদের আবার ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্ত ফ্যাসিষ্টবা প্রাণপণে প্রচার কার্য আরম্ভ ক'বল। খুব ছোট ছোট ছেলেদেরও যুদ্ধ-ভাবাপন্ন ক'রে তুলবার জন্ত ইস্কুল থেকেই তাদের শেখান হ'তে লাগল, “যুদ্ধ মানুষকে সভ্য কবে, শান্তি মানুষকে

অমাহুয ক'রে দেয।” “দেশের জন্ত (অর্থাৎ কলোনীর জন্ত) যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে, গৌরবময় মৃত্যু আর হ'তে পারে না” ইত্যাদি। সব জায়গায় যুবকদের যুদ্ধ শেখান হ'তে লাগল। কলকাবখানায় গোলাবারুদ ও যুদ্ধের জিনিসপত্র বেশী ক'বে তৈরী ক'বতে লাগল।

ইটালীতে যে যে কাবণে ফ্যাসিজম্ দেখা দিল, ঠিক সেই সেই কাবণেই জার্মানীতেও ফ্যাসিজম্ দেখা দিল। শুধু এখানে ফ্যাসিজম্, ফ্যাসিজম্ নাম না নিয়ে, নাৎসীজম্ নাম নিল। কিন্তু ফ্যাসিজম্ ও নাৎসীজম্‌এর ভিতর আসল ব্যাপারে কোন রকম বিভিন্নতা নেই। নাৎসীবাদ শুধু ফ্যাসিবাদ থেকে আবও বেশী উগ্র, আরও বেশী নৃশংস।

১৯১৮ সালের যুদ্ধের শেষের দিকেই জার্মানীর শ্রমিকরা যুদ্ধের অসহ্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'বতে না পেবে, বিদ্রোহ কবে। কিন্তু কয়েকজন শ্রমিকনেতাব বিশ্বাসঘাতকতাব ফলে এবং ইংরাজ ও ফরাসী ক্যাপিটালিষ্টদের চাপে শ্রমিকদের হাতে ক্ষমতা আসে না, ক্যাপিটালিষ্টদের হাতে থেকে যায়। ক্যাপিটালিজম্ থেকে যাওয়ার ফলে জনসাধারণের দাবিদ্র্য-বৃদ্ধি, ব্যবসা-সঙ্কট, অবিব্রীত মালে বাজাব বোঝাই হ'য়ে যাওয়া, বেকার শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি সকল লক্ষণ-গুলোই প্রকাশ পেতে থাকে। এর উপরে আবার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে অনেক টাকা বছরে বছরে ইংরাজ ও ফরাসীরা আদায় ক'রে নেওয়ায় জনসাধারণের দুর্দশা আরও

বেড়ে যায়। জার্মানীর কোন কলোনী না থাকায় এই সব সমস্যার আংশিক সমাধানও হয় না। জনসাধারণেব ভেতর অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। এর উপরে আবার মরার উপর খাঁড়াব ঘর মত ১৯৩১ সালের প্রচণ্ড ব্যবসা-সঙ্কট এসে জার্মানীর লোকদের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে দেয়। চারিদিকে অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিকরা এই দুর্দশা হ'তে বাঁচাব উপায় হিসেবে ক্যাপিটালিজমের ধ্বংস দাবী করে, আর ক্যাপিটালিষ্টরা দাবী করে কলোনী ও শ্রমিক-আন্দোলনের ধ্বংস। শ্রমিক ও ধনিকের যুদ্ধ তীব্র হ'তে তীব্রতব হ'তে থাকে। ধনী-শ্রেণী হিটলারের দলবলের ভেতব তাদের পবিত্রাণ দেখতে পায়। যুদ্ধে হেবে গিয়ে হিটলার “নাৎসী” বা “জাতীয় সোসালিষ্ট” নাম দিয়ে একটি দল খোলে। ১৯৩১ সাল অবধি জার্মানীতে তাবা বিশেষ পান্তা পেত না। কিন্তু ১৯৩১ সাল থেকে জার্মানীর ক্যাপিটালিষ্টরা দেখল যে শ্রমিকরা যে-বকম সজ্জবদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে তাতে শ্রমিক-আন্দোলন শীঘ্র ধ্বংস ক'রে না দিলে তাদের আব বক্ষা নেই। তাই হিটলারের দলকে তারা সাহায্য ক'বতে লাগল। শুনা যায় ব্রিটেনেব ও ফ্রান্সের ক্যাপিটালিষ্টরাও হিটলারকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য ক'বেছিল, যাতে জার্মানীতে শ্রমিকরা ক্ষমতালাভ না ক'বতে পাবে। এই সব সাহায্যের ফলে হিটলারের নাৎসী দল বেশ শক্তিশালী হ'য়ে উঠতে লাগল। শ্রমিকরা কিন্তু

তাদের এ-বিপদের কথা বুঝতে পাবল না। জাশ্বানীতে তখন ছোটো বড় শ্রমিকদল ছিল, একটার নাম “সোসাল ডেমোক্রাটিক” দল ও অপবটার নাম “কম্যুনিষ্ট” দল। সোসাল ডেমোক্রাটিক দল ক্যাপিটালিজম্ একেবাবে ধ্বংস ক’বে না দিয়ে তাব সঙ্গে রফা ক’রে ধীবে ধীবে শ্রমিকদের ক্ষমতা বাড়াবাব পক্ষপাতী ছিল। অন্যদিকে কম্যুনিষ্টবা ক্যাপিটালিষ্টদের ধ্বংস ক’বে দিয়ে শ্রমিক গভর্ণমেন্ট স্থাপন কবাব পক্ষপাতী ছিল। এই নিয়ে এ-দু’দলে ঝগড়াঝাটী লেগেই ছিল। কিন্তু এব ফল হ’ল খুব খাবাপ, শ্রমিকবা বিভক্ত হ’য়ে বইল। এদিকে ক্যাপিটালিষ্টবা ক্রমেই নাৎসীদলে সম্ববদ্ধ হ’তে লাগল। কিন্তু হাজাব সম্ববদ্ধ হ’লেও দেশে ক্যাপিটালিষ্ট থাকে আব ক’জন? খুব অল্প ক’জন। কাজেই তাবা অন্যান্য শ্রেণীর সহযোগিতা না পেলে এবং শ্রমিকদের ভেতব বিভেদ সৃষ্টি ক’বে দিতে না পাবলে বিশেষ কিছু ক’বতে পাবে না। কাজেই অন্যান্য শ্রেণীব লোকের সহানুভূতি পাবাব জন্য চালাক হিট্‌লাব তাব দলের প্রোগ্রামের ভেতব সব শ্রেণীব লোকের দাবী দাওয়া কিছু কিছু ঢুকিয়ে নিল। যেমন কৃষকদের তুষ্ট ক’বাবাব জন্য বল্ল, “কৃষকদের ফসলের উপযুক্ত দাম দিতে হবে,” “কৃষকদের স্কুদের হার কম ক’রে দিতে হবে।” শ্রমিকদের সম্বুষ্ট ক’ববার জন্য বল্ল, “ক্যাপিটালিজম্‌ব বিবোধিতা ক’রতে হবে।” ছোট ছোট দোকানদারদের হাত ক’ববার জন্য বল্ল,

“বড় ব্যবসাদারদের ক্ষমতা লোপ ক’রতে হবে” ইত্যাদি। এ-ছাড়া প্রত্যেক জার্মানই ভার্সাই-সন্ধি-পত্রের (গত ১৯১৪-১৮ এর যুদ্ধে পবাক্রয় স্বীকার ক’বে ইংরাজ ও ফরাসীদের সঙ্গে জার্মানী যে সন্ধি কবে) বিরুদ্ধে মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ ক’রত। হিটলাব তাই ভার্সাই-সন্ধি-পত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে লাগল। যিহুদীদের বিরুদ্ধে ইউরোপের লোকেব অনেকদিন থেকে ঘৃণাভাব আছে, সেই ঘৃণা-ভাবটাকেও কাজে লাগাল। দেশের যত কিছু দুঃখ, দুর্দশা তার কাবণ হিটলাব প্রচার ক’বতে লাগল ভার্সাই-সন্ধি, যিহুদী ও কম্যুনিষ্টরা। এমনি ক’বে জনসাধাবণেব বাজ-নৈতিক অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ভাঙ্গিয়ে নাৎসীব দলে লোক সংগ্রহ ক’বতে লাগল। ১৯১৯ সালেব পর থেকে জার্মান আইন-সভাব প্রত্যেক নির্বাচনে হিটলাবেব নাৎসীদলেব ও কম্যুনিষ্টদলেব ভোট সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল এবং জার্মানীর অন্যান্য দলগুলোব ভোট সংখ্যা কমে যেতে লাগল। এর থেকে বোঝা যায় ধনিক ও শ্রমিকেব ঝগড়া অত্যন্ত তীব্র হ’য়ে উঠেছিল এবং জার্মানীব প্রত্যেকেই হয় ধনীর দিকে কিম্বা শ্রমিকেব দিকে যোগ দিচ্ছিল। দেশেব শ্রেণী-সংগ্রাম যখন এই বকম তীব্র হ’য়ে উঠ’ল, তখন জার্মানীব ক্যাপিটালিষ্ট-শ্রেণী হিটলাবেব হাতে দেশের শাসন ভাব ছেড়ে দিল।

হিটলাব শাসনভার পেয়েই তার প্রথম কাজ শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস ক’বতে লেগে গেল। শ্রমিক নেতাদের

বিনা বিচারে “কন্সেন্সেশান ক্যাম্প” নামক এক রকম জেলখানায় ধরে আটক ক’রে রাখল, অনেককে গোপনে হত্যা করা হ’ল। শুধু যে শ্রমিক নেতাবাই মারা বা ধবা প’ড়ল তা নয়, যারা নাৎসীদের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ ক’রল, তারাও বিপদগ্রস্ত হ’ল। নাৎসী গুলুগুলা দলে দলে গিয়ে তাদের বাড়ীর ভেতর ঢুকে তাদের উপর অসম্ভব অত্যাচার ক’রতে লাগল। যিহুদীরাও এই অত্যাচার ভোগের উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করে। বিখ্যাত যিহুদী বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন পালিয়ে নাৎসীদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচালেন। এমনি যারা যাবা পালাতে পাবল, তারা বাঁচল, যাবা পাবল না, তাদের ধরে অত্যাচার ক’বতে ক’বতে মেবে ফেলা হ’ল। এই বকম ভাবে অত্যাচার ক’রে হিটলার তাব বিরুদ্ধপক্ষীয় সব দল-গুলোকে ধ্বংস ক’বে নাৎসীদলের একাধিপত্য বিস্তার ক’বল, ফ্যাসিজমের যে প্রথম কাজ অর্থাৎ শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস ক’রে ক্যাপিটালিজমকে নিবাপদ করা, তা এই বকম নিষ্ঠুরতার ভিত্তি দিয়ে সাধিত হ’ল।

প্রথম কাজ শেষ ক’বে নাৎসীরা এবাব ফ্যাসিজমের দ্বিতীয় কাজে লেগে গেল, অর্থাৎ কলোনী আদায় ক’রে নেবার বন্দোবস্ত ক’রতে লাগল। কলোনী আদায় ক’রতে গেলেই যুদ্ধের দরকাব হয়। কাজেই জার্মানজাতিকে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত করার কাজে নাৎসীরা উঠে পড়ে লেগে গেল। একদিকে যেমন দ্রুত যুদ্ধের জন্ত অস্ত্র শস্ত্র, গোলা বারুদ

তৈরী ক'রতে লাগল, তেমনি লোকের মন যুদ্ধের জন্ত
 ক্ষেপিয়ে তুলবারও চেষ্টা ক'রতে লাগল। ইটালীর ফ্যাসিষ্টদের
 মত জার্মানীও নাৎসীরা যুদ্ধের মহিমা কীর্তন ছাড়াও আর
 এক মতবাদ আবিষ্কার ক'বল। এই মতবাদ অনুযায়ী তারা
 প্রত্যেক জার্মানকে শেখাতে লাগল, “জার্মানজাতি পৃথিবীর
 মধ্যে সব চেয়ে বড় জাতি। আর সব জাতির উপর প্রভুত্ব
 ক'ববার জন্ত জার্মানজাতি সৃষ্ট হ'য়েছে। সুতরাং প্রত্যেক
 লোক যাব শিষ্য জার্মান বস্তু বয়, তাকে জার্মান জাতির
 এই গৌরবময় কাজের জন্ত প্রাণ দিতে হবে।” সহজ কথায়
 “প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে জার্মান ক্যাপিটালিষ্টদের জন্ত কলোনী
 আদায় ক'বে দাও”—এই হ'ল নাৎসী শিক্ষার মূলমন্ত্র। এমনি
 ভাবে তাবা দেশকে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত ক'বল এবং অন্ধ ও উগ্র
 দেশপ্রেমই তাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির খোবাক যোগাল।
 মধ্যবিত্ত যুবকশ্রেণী বিশেষ ক'বে এই অন্ধদেশপ্রেমের
 বুলিতে সাড়া দিল এবং সাম্রাজ্য-বিস্তারের কাজে ধনিকদের
 হাতের ক্রীড়নক হ'য়ে পড়ল। তাবা ভেবে দেখল
 না, দেশপ্রেম মানে অপরের দেশপ্রেম নষ্ট ক'বে দিয়ে
 অপরের দেশ দখল ক'বা নয়। খাঁটি দেশপ্রেম কখনও কোন
 প্রকার সাম্রাজ্যবাদের হাতের খেলাব পুতুল হ'তে পারে না।
 খাঁটি দেশপ্রেম মানে স্বাধীনতা, এক দেশের স্বাধীনতা
 নষ্ট ক'বে দিয়ে আর এক দেশের স্বাধীনতা কখনও সম্ভব হয়
 না। যাবা নিজের দেশকে বড় ক'বতে গিষে অপ'ব দেশকে

ছোট ক'বে দেয়, অন্য জাতের স্বাধীনতা নষ্ট ক'রে দেয় এবং অন্য দেশের লোকদের উপর অযথা অত্যাচার করে, তাবা কখনও স্বাধীনতাকে সম্মান কবে না। আসলে নিজেব দেশের লোকদেরও স্বাধীনতা তাবা মুখেই স্বীকাব কবে, কাজে স্বীকাব কবে না। কিন্তু এত সব কথা জাশ্মান যুবকবা ভেবে দেখল না। অন্ধ দেশপ্রেমের ভ্রান্ত আছবানে তাবা উত্তেজিত হ'য়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে স্বাধীনতা তাবা পেল না, স্বাধীনতা'ব টুঁটি টিপে তাকে তাবা ধ্বংস ক'বল। সাম্রাজ্যবাদেব যুপকাঠে স্বাধীনতা'ব নাম ক'বে, দেশেব নাম ক'বে, এই সব আদর্শনিষ্ঠ বিভ্রান্ত যুবকদের বলি দেওয়া হ'ল।

জাপানেও জাপানী-মার্কী ফ্যাসিবাদ স্থাপিত হ'ল একই বকমভাবে এবং এই তিন কলোনীহীন বাজ্যেব মধ্যে গভীর মিতালী স্থাপিত হ'ল, যাতে ক'বে তাবা পবম্পব কলোনী আদায়েব কাজে সাহায্য ক'বতে বাজী হ'ল। এমনি ভাবে আযোজন শেষ ক'বে তারা যুদ্ধ আবস্ত ক'রল। বর্তমান যুদ্ধ এমনি ক'বেই আবস্ত হ'ল।

আমবা তা হ'লে দেখতে পাচ্ছি, ফ্যাসিজম ইটালী জার্মানী ও জাপানে একই কাজেব জ্ঞাত স্থাপিত হ'য়েছে। অবস্থা বিশেষে সামাগ্র অদল-বদল আছে, কিন্তু আসলে তারা সব এক। আমবা দেখেছি, ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ঝগড়া যখন খুব বেড়ে যায়, তখনই ধনী শ্রেণী খোলাখুলি ভাবে ফ্যাসিষ্টরূপ নেয় এবং শ্রমিক আন্দোলন

ধ্বংস করাও চেষ্টা করে। যদি শ্রমিক শ্রেণী দ্বিধা বিভক্ত থাকে, তবে সহজেই ক্যাপিটালিষ্টরা শ্রমিকদের হাবিয়ে দেয় এবং তাদের একাধিপত্য স্থাপন করে। সুতরাং ফ্যাসিজমের দু'টো কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রথমতঃ শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা, দ্বিতীয়তঃ শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর একতাব অভাব। ফ্যাসিজমের কাজ হ'লো দু'টো। প্রথম কাজ, শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস ক'বে বিপ্লবের হাত থেকে ক্যাপিটালিজমকে বাঁচানো, এবং দ্বিতীয় কাজ, যুদ্ধ ক'বে কলোনী আদায়েব চেষ্টা করা। সুতরাং ফ্যাসিবাদকে ক্যাপিটালিজম থেকে ভিন্ন ক'বে দেখলে ভুল করা হবে। ক্যাপিটালিজম এক বিশেষ অবস্থায় এসে ফ্যাসিবাদে রূপ নেয় মাত্র। ফ্যাসিজম ক্যাপিটালিজমের বিকল্পে তো নয়ই, বরং ক্যাপিটালিজমকে বাঁচাবার জন্তই এর সৃষ্টি। শ্রমিক বিপ্লবের সম্ভাবনাকে ধ্বংস ক'বে দেবার জন্ত এবং কলোনী আদায়েব জন্ত ক্যাপিটালিজমের যে নগ্নরূপ, তাকেই আমরা ফ্যাসিজম বলতে পাবি।

ফ্যাসিজমের ভবিষ্যৎ কি ? ফ্যাসিজমের উৎপত্তির কারণ যদি ভাল ক'বে বুঝে থাক তবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হবে না। পুঁজিবাদ যে সকল মূল সমস্যা সৃষ্টি করে (যেমন ব্যবসা-সঙ্কট, বেকার, ইত্যাদি) তার কোন সমাধান ক'রতে না পেরে পুঁজিবাদই ফ্যাসিবাদের রূপ নেয়। কিন্তু ফ্যাসিবাদও কি এই সকল সমস্যা সমাধান

ক'রতে পারে? না, পারে না। কারণ, ফ্যাসিবাদ এই সকল সমস্যা সমাধান করতে পারে না, তাই যুদ্ধ ক'রে কলোনী আদায়ের চেষ্টা করে। কলোনী পেনেই সকল সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে এই তারা ভাবে। কিন্তু এরকমভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ছুদিক থেকে বিপদ আছে। প্রথমতঃ, যদি যুদ্ধে হেরে যায়, তবে সমস্যার সমাধানত হয়ই না বরং উন্টো শ্রমিক বিপ্লব হ'য়ে দেশে ফ্যাসিবাদের গোড়া শুদ্ধ উপড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে প্রচুব। যুদ্ধেব ফলে লোকের দুঃখ কষ্ট অসম্ভব বেড়ে যায়। যতদিন অবধি ফ্যাসিষ্টরা যুদ্ধে জিততে থাকে ততদিন অবধি ফ্যাসিষ্টদেশের লোকেরা ভাবে—'দেশের গৌরব হ'চ্ছে এবং কলোনী পেনেই ভবিষ্যতে তাদের দুঃখ ঘুচবে', এই সব ভেবে সব দুঃখ কষ্ট ততদিন তারা সহ্য করে। কিন্তু যুদ্ধে হাবতে আরম্ভ ক'বলেই এ আশায় ছাই পড়ে। অপবের দেশ জয় করাকে যারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেম বলে ভাবত, তাবাও মুষড়ে পড়ে। চারিদিকে হতাশাব ভাব ছড়িয়ে পড়ে। ভবিষ্যতের স্বর্গ চুরমার হ'য়ে যাওয়ায় বর্তমানের দুঃখ কষ্ট সহ্য করার আগ্রহ কারও দেখা যায় না। সুযোগ বুঝে শ্রমিক শ্রেণী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহ ক'রে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত ক'রবার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধে যদি ফ্যাসিবাদীরা জিতেও যায়, তাহলেও বেশীদিন সুখে রাজত্ব করা ও কলোনীর লোকদের শোষণ করার সুবিধা ভোগ

ক'তে পারে না। একদিকে কলোনীর লোকদের স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হ'তে থাকে, অন্যদিকে আবাব কলোনীর বাজাবও শীঘ্র ফ্যাসিবাদী দেশের উৎপাদিত পণ্যে বোঝাই হ'য়ে যায়। ফলে আবাব ব্যবসা-সঙ্কট উপস্থিত হয়, আবাব লোক বেকার হ'য়ে যেতে থাকে এবং পুঁজিবাদী আমলের সকল সমস্যাই গুরুতর আকারে দেখা দেয়। সেই সমস্যা সমাধান ক'রতে না পারায় কলোনীতে এবং ফ্যাসিবাদীদের নিজেব দেশে শ্রমিক বিপ্লব দেখা দেয়। এই বিপ্লবেব ধাক্কা ফ্যাসিবাদী-প্রথা ভেসে যায়। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, ফ্যাসিবাদী-প্রথা সমাজে বেশীদিন টিকতে পারে না। তার ভেতবকার বিষেব জালায় সে কিছুদিন খুব ছটফট করে বটে এবং ছ'চারটে হুঙ্কারও ছাড়ে বটে, কিন্তু এই বিষই তাকে অচিরে ধ্বংস কবে দেয়।

[চার]

সোশ্যালিজম্ বা সমাজতন্ত্রবাদ

সোশ্যালিজমের জন্মঃ

পৃথিবীর কোন কিছু স্থিৰ থাকে না, সবই বদলে যায়। তেমনি আজকে যে পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশগুলোতে ক্যাপিটালিজম্ দেখ্ছ এমনটি চিবকাল ছিল না। একদিন ছিল, যখন মানুষ সবেমাত্র পশুত্বের খাপ থেকে মানুষের

ধাপে পা' দিয়েছে, তখন মানুষ উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার কাকে বলে, এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য কি ক'বে জিনিসপত্র তৈরী হয়, তা কিছুই জানত না। সেই আদিম যুগে, মানুষ দলবদ্ধ হ'য়ে থাকত। পবম্পবেব ভেতরে যাদের বক্তের যোগাযোগ ছিল, তাবা এক একটা দল গঠন ক'বে একসঙ্গে বাস ক'বত। এই দলগুলোকে বলা হয় গোষ্ঠী বা "ট্রাইব"। ট্রাইবেব সামান্য যা উৎপাদন-যন্ত্র, তীব-ধনুক, লাঠি-সোঁটা, তাতে ট্রাইবেব সকলের অধিকার ছিল এবং তাই দিয়ে একসঙ্গে দলবদ্ধ হ'য়ে শিকার ক'বে এবং গাছের ফলমূল আহরণ ক'বে যা পেত তা সবাই এক সঙ্গেই ভোগ ক'বত। এমনি ক'বে বনে বনে ঘুরে তাদের জীবন বেটে যেত। এ বকম অবস্থায় থাকলে উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার বা ব্যক্তিগত লাভের জন্য উৎপাদন সম্ভব হয় না। তাই তাবা সবাই এক সঙ্গে থাকত, এক সঙ্গে যা কিছু আয় ক'বত, এক সঙ্গে তা ভোগ ক'বত। এই জন্তে মানুষের এই অবস্থাকে বলা হয় আদিম কম্যুনিজম্ (Primitive Communism)

আদিম কম্যুনিজম্ বেশী দিন টিকল না। মানুষ নানা-রকম যন্ত্র-পাতি আবিষ্কার ক'রল, যাতে ক'রে তাদের জীবন-যাত্রা অনেকটা সহজ হ'য়ে এল। পশু-পক্ষী পোষ মানাতে শিখল, গাছ-পালাও পোষ মানিয়ে নিল, অর্থাৎ চাষ-বাস শিখল। এর ফলে আর বনে বনে মাংস ও ফল-মূলের জন্য

ঘূৰে বেড়াবার দরকাৰ হ'ল না। এক জায়গায় বসেই সব পেল। কাজেই মানুহ তখন ভাল জায়গা দেখে বসতি ক'রল ও ঘৰ-বাড়ী বাঁধল। জায়গায় জায়গায় গ্রাম গড়ে উঠল। এই অবস্থাব প্ৰথম দিকেও সবাই পশু-পক্ষী, জায়গা জমি ও অন্যান্য উৎপাদন-যন্ত্ৰেব অধিকারী ছিল এবং সবাই মিলে আবশ্যক জিনিস-পত্ৰ তৈরী ক'বত ও ভোগ ক'বত। কিন্তু ধীৰে ধীৰে তাদের ভিতৰ শ্ৰম-বিভাগ এসে দেখা দিল, অৰ্থাৎ, এক-একটা কাজ সবাই মিলে না ক'বে, এক-একজন ক'বে বা কয়েকজন ক'বে ভাগ ক'বে দেওয়া হ'ল। কাৰণ, দেখা গেল যে এক এক জনকে শুধু এক একটা কাজ দিলে, সে সে-কাজটা খুব ভাল ভাবে ক'বতে পাবে এবং সেই কাজটা নিয়ে প'ড়ে থাকে ব'লে সেই কাজে সে খুব দক্ষতা লাভ করে। আব এই বকম ক'বে সমাজেব সব কাজগুলোই খুব ভাল ভাবে হ'যে যায়। শ্ৰমবিভাগেব সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়ও আবশ্য হ'ল। প্ৰথম এক ট্ৰাইবেব যা কিছু বেশী জিনিস উদ্ভূত থাকত, তা অন্যান্য ট্ৰাইবেব উদ্ভূত জিনিসপত্ৰেব সঙ্গে অদল-বদল কৰা হ'ত। শেষে এই কাজেব ভাবও পড়ল কয়েকজন বিশেষজ্ঞেব উপর যাবা অন্যান্য ট্ৰাইবগুলোব সম্বন্ধে সব খবৰাধিবব জানত। সমাজে লোকসংখ্যাও খুব বেড়ে যেতে লাগল। এট সব কাৰণে সমাজেব জিনিসপত্ৰ তৈরীৰ ক্ষমতা খুব বেড়ে গেল এবং ধীৰে ধীৰে উৎপাদন-যন্ত্ৰে সকলেব অধিকাৰ আব রাখা গেল না, ব্যক্তিগত অধিকাৰ এসে দেখা

দিল। এমনি ক’রে আদিম-কম্যুনিজমের যুগ শেষ হ’য়ে গেল। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারের যুগ প্রতিষ্ঠা হ’ল।

সম্পত্তি যখন ব্যক্তিগত অধিকারে এসে গেল, তখন ধীরে ধীরে সমাজে নানা বকম শ্রেণী দেখা দিল। এর আগে কিন্তু সমাজে শ্রেণী বলে কিছু ছিল না। সকলের অবস্থাই এক বকম ছিল। উৎপাদন-যন্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার ছিল, কাজেই শ্রেণী বলে আদিম-কম্যুনিজমের আমলে কিছু ছিল না। সম্পত্তিতে যখন ব্যক্তিগত অধিকার এসে গেল, তখন থেকেই সমাজে শ্রেণী দেখা দিল। উৎপাদন-যন্ত্রে কার কতখানি অধিকার বা কার কতখানি উৎপাদন-যন্ত্র (বা সম্পত্তি) আছে, তাই দিয়ে কে কোন শ্রেণীতে থাকবে তা ঠিক হয়। এক দল লোক হ’ল, যাদের কোন সম্পত্তি থাকল না, তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হ’ল শারীরিক পরিশ্রম। গতব খাটিয়ে কিছু আয় ক’রে তাবা বেঁচে থাকল। আর একদল লোক হ’ল ঠিক এর উল্টো, তারা এত সম্পত্তির মালিক হ’ল যে, তাদের আর পরিশ্রম করার দরকার হ’ল না, সম্পত্তি থেকেই তাবা প্রচুর আয় ক’বতে লাগল, এবং অপরের পরিশ্রমের উপরেই এরা বেঁচে রইল পরগাহার মত। এর মাঝামাঝি আবার অনেকগুলো শ্রেণী হ’ল, যাদের আয় কিছু সম্পত্তি থেকে হ’ত, আর কিছুটা হ’ত পরিশ্রম ক’রে। এমনি ভাবে নানা শ্রেণী হ’য়ে সমাজ ভাগ ভাগ হ’য়ে গেল।

যারা প্রচুর সম্পত্তির মালিক হ'ল তারা তাদের সম্পত্তি বক্ষাব জন্ত “রাষ্ট্র” (State) নামে একটা সংগঠনের সৃষ্টি ক'বল। রাষ্ট্রের কাজ হ'ল দু'বকম—এক, সমাজে যাদের উৎপাদন-যন্ত্রে কোন অধিকার নেই, সেই সব সম্পত্তিহীন লোকদের আক্রমণ থেকে উৎপাদন-যন্ত্র বক্ষা করা ও এই উৎপাদন-যন্ত্র তাদের মালিকদের জন্ত চালু থেকে যাতে লাভ সৃষ্টি করে তাব ব্যবস্থা করা। দুই, বিদেশের সম্পত্তি-ওয়ালাদের আক্রমণ থেকে তাদের সম্পত্তি বাঁচান। এই কাজ করার জন্ত রাষ্ট্র দু'বকম ব্যবস্থা ক'বল। এক, উৎপাদন-যন্ত্র যাতে সম্পত্তিওয়ালাদের হাতছাড়া না হ'য়ে যায় এবং ঠিকমত তাদের লাভের জন্ত চালু থাকে তাব উদ্দেশ্যে “আইন” তৈরী করা। দুই, এই আইন যাতে ঠিক মত কাজে লাগে এবং সবাই মেনে চলে, সৈন্ত, পুলিশ, গুপ্তচর, বিচার, জেল প্রভৃতি বেখে, তাব ব্যবস্থা করা। উৎপাদন-যন্ত্র ঠিকমত চালু রাখতে হ'লে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ভাল থাকা চাই, তাব দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্ত রাষ্ট্র স্বাস্থ্য-বিভাগ খোলে। শ্রমিকদের খানিকটা শিক্ষাও দেয়া দরকার, তাব জন্ত শিক্ষা-বিভাগ, তাবা নিজেদের ভেতর মারামারি কাটাকাটি ক'বলে কাজের ক্ষতি হয়, তাই শাস্তিবক্ষা বিভাগ ইত্যাদি খোলা হয়। এমনি ক'বে রাষ্ট্র যে শ্রেণীর সম্পত্তির মালিক, তাদের ক্ষমতা ও সম্পত্তি বক্ষাব জন্ত পাহারাদারী করে। মোটামুটি রাষ্ট্র হ'ল একটা যন্ত্র-স্বরূপ, যা দিয়ে শাসক শ্রেণী-অন্য

শ্রেণীগুলোকে বশে বাখে। এমনি ভাবে আদিম কম্যুনিজম ভেঙ্গে যাওয়ার পব, সম্পত্তির মালিক-শ্রেণী তাদের শাসন ও শোষণ বজায় রাখার জন্য বাস্তব সৃষ্টি ক'রল, এবং বাস্তব সাহায্যে তাদের শাসন ও শোষণ বজায় রাখতে লাগল।

কিন্তু অত্যাচার শ্রেণীগুলো তাদের ওপরে এই কর্তৃত্ব মুখ বুজে সব সময় সহ্য ক'রল না। শাসক-শোষক শ্রেণী ও শাসিত-শোষিত শ্রেণীগুলোর মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকল। কখনও কখনও সে ঝগড়া প্রকাশ্যে ভীষণ আকার ধারণ ক'বে ফুটে উঠত। কখনও বা তা টেব পাওয়া যেত না। কিন্তু ঝগড়া লেগেই ছিল। এই শাসক-শোষক শ্রেণীর সঙ্গে শাসিত-শোষিত শ্রেণীর যে ঝগড়া, তাকেই বলে শ্রেণী-সংগ্রাম (Class Struggle)। এই শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে অনেকবার সমাজে শাসক-শাসিত শ্রেণীর অদল বদল হ'য়েছে। যাবা নীচে পড়ে ছিল, তাবা ওপরে উঠে গিয়ে শাসক-শ্রেণীকে ধ্বংস ক'রে দিয়ে নিজেবাই শাসক-শ্রেণী হ'য়েছে। ফবাসী বিপ্লবের কথা তোমবা বোধ হয় শুনে থাকবে। এই ফবাসী বিপ্লব এমনি একটা শাসক-শ্রেণী বদলের ঘটনা।

ফবাসী-বিপ্লবের আগে অবধি কৃষিকাজই সমাজের প্রধান পেশা ছিল এবং উৎপাদন-যন্ত্রের ভেতর জায়গা-জমিই ছিল সব চেয়ে প্রধান। কাজেই এম মালিক যাবা, অর্থাৎ জমিদারবাই সমাজে বাজহ ক'রত। তাবাই ছিল সমাজের সব চেয়ে উচ্চ স্তরে। তাদের নীচে আবার অনেক-

শুলি শ্ৰেণী ছিল, যেমন বণিক-শ্ৰেণী, শ্ৰমিক-শ্ৰেণী, কৃষক-শ্ৰেণী ইত্যাদি। এই সব শ্ৰেণীৰ উপৰ মোডলী ক'ৱত জমিদাৰ-শ্ৰেণী। সেই জগতে এই যুগকে বলা হ'ত 'জমিদাৰ-তন্ত্ৰ' বা 'ফিউডালিজম'। কিন্তু এই ফিউডালিজমেৰ ভেতৰ থেকেই বণিক-শ্ৰেণী ধীবে ধীবে খুব শক্তিশালী হ'য়ে উঠতে লাগল। এই সময় আমেৰিকা ও ভাৰতবৰ্ষে আসাৰ সমুদ্ৰ-পথ আবিষ্কাৰ হ'ল। দেখতে দেখতে এই সব দেশ থেকে সোনা-ৰূপো এনে ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক'বে বণিকদেৰ পুঁজি জমিদাৰদেৰ চেয়ে অনেক বেশী বেড়ে গেল। আগে শ্ৰমিকবা কাৰিকৰদেৰ মত নিজেৰ নিজেৰ কুটিৰে বসে, নিজে কাঁচামাল কিনে নিজেৰ সামান্য উৎপাদন-যন্ত্ৰেৰ সাহায্যে পণ্য তৈৰী ক'বত, আব বণিকবা তাৰদেৰ কাছ থেকে এই সব পণ্য কিনে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ক'বত। যখন বণিকদেৰ পুঁজি বেশ খানিকটা বেড়ে গেল, তখন বণিকবা নিজেবাই কাৰখানা তৈৰী ক'ৱে মজুৰ লাগিয়ে পণ্য তৈৰী কৰাতে লাগল। এতে ক'বে তাৰদেৰ লাভ অনেক বেশী হ'তে লাগল এবং যতই তাৰদেৰ লাভ বেড়ে যেতে লাগল, ততই তাৰদেৰ পুঁজি বাডতে লাগল এবং তাৰদেৰ ক্ষমতাও বেড়ে যেতে লাগল। প্ৰথমে ছোট ছোট কাৰখানা খোলা হ'ল। দেখতে দেখতে সেগুলো বড় কাৰখানায় পৰিণত হ'ল। তাতে নানা কল-কজা বসল। বাষ্পেৰ দ্বাৰা চালু কল আবিষ্কাৰ হ'ল। উৎপাদন-ক্ষমতা এমনি ক'বে এত বেড়ে গেল যে, হাজাৰ হাজাৰ পণ্য এই

সব কারখানায় অতি অল্প সময়ে তৈরী হ'য়ে যেতে লাগল। আব যতই উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়ে যেতে লাগল, ততই বণিক-দলেব শক্তি বাড়তে লাগল। কাৰণ তাৰেব পুঁজি, টাকা পয়সা বেড়ে গেল অনেক। কিন্তু তখনও বাষ্ট্ৰ ছিল জমিদাৰদেব হাতে। জমিদাৰবা নানা বকম ভাবে বণিকদেব জৰু কবাৰ চেষ্টা ক'বতে লাগল। এক জমিদাৰী থেকে আব এক জমিদাৰীতে মাল বিক্ৰী কবাৰ জন্তু নিলেই ট্যাক্স আদায় ক'বত। কৃষকবা যাতে জমি ছেড়ে কাৰখানায় চলে না যায় তাৰ চেষ্টা ক'বত। এমনি ক'বে জমিদাৰদেব হাতে বাষ্ট্ৰ থাকাৰ বণিকদেব অসুবিধা হ'ত খুব। কাজেই তখন তাৰা বাষ্ট্ৰ-ক্ষমতা দখল কববাৰ জন্তু উঠে-পড়ে লেগে গেল। আব শ্ৰমিক-কৃষকবাও জমিদাৰদেব উপৰ সন্তুষ্ট ছিল না। তাৰাও বণিকদেব সঙ্গে যোগ দিল। এই সব শ্ৰেণীগুলো একসঙ্গে যোগ দিয়ে ফিউডালিজম্ ধ্বংস ক'বল। তাৰ জায়গায় বসান হ'ল বণিকদেব বাজ্ৰ অৰ্থাৎ ক্যাপিটালিজম্। বণিকদেব ওদেশে ব'লত “বাবগাস” (Burghers) সেই থেকে ক্যাপিটালিষ্টদেব নাম হ'য়েছে ‘বুৰ্জোয়া’। আব শ্ৰমিকদেব নাম হ'ল ‘প্ৰোলেটাৰিয়াট’ বা সৰ্বহাৰা। জমিদাৰদেব হাত থেকে বাষ্ট্ৰ-ক্ষমতা বুৰ্জোয়াদেব হাতে চলে যাওয়াই হ'ল ফৰাসী-বিপ্লবেব আসল কথা।

ইউৰোপেব সব দেশেই এই বকম ছোট-খাট বিপ্লবেব ভেতৰ দিয়ে বুৰ্জোয়াৰা বাষ্ট্ৰ-ক্ষমতা পেল। বাষ্ট্ৰ-ক্ষমতা

পেয়ে তারা এবার পৃথিবীটাকে তাদের নিজেদের মত ক'বে গুছিয়ে-গাছিয়ে নেবার চেষ্টা ক'বতে লাগল। আইন-কানুন বদলে গেল, সমাজের বীতিনীতি বদলে গেল। পুৰনো ধারণাগুলো অবধি আর টিকল না। এমনি ক'বে শুধু যে পণ্য উৎপাদনের উপায় বদলে গেল তা নয়, মানুষের জীবনের সব কিছুই উলোট-পালট হয়ে গেল। এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হ'ল—'বুর্জোয়া সভ্যতা'।

বুর্জোয়াবা তাদের নিজেদের সুবিধে অনুযায়ী পৃথিবীটাকে গড়ে নিল বটে, কিন্তু নিশ্চিন্তে ব'সে পৃথিবী ভোগ ক'বা আব তাদের হ'য়ে উঠল না। আমরা একেব অধ্যায়ে দেখেছি ক্যাপিটালিজম্ মানেই হচ্ছে উৎপাদন-যন্ত্র ব্যক্তিগত অধিকার ও ব্যক্তিগত লাভেব জন্ম এই উৎপাদন-যন্ত্র ব্যবহার ক'বে পণ্য উৎপাদন। কিন্তু উৎপাদন-যন্ত্র ব্যবহার ক'বে পণ্য উৎপাদন ক'বতে গেলে শ্রমিকদের সাহায্য ছাড়া তা হয় না। কাজেই লাভ সৃষ্টি ক'বতে গেলে শ্রমিকদেরও সৃষ্টি ক'বতে হয়। আব পুঁজি যত বেড়ে যেতে থাকে শ্রমিকদের সংখ্যাও তত বেড়ে যেতে থাকে। আগে ছোট কাবখানায় যেখানে ১০০ শ্রমিক কাজ ক'বত এখন সেখানে হয়ত হাজারে হাজারে শ্রমিক কাজ ক'বতে থাকে। কিন্তু শ্রমিকবা হাজার পবিশ্রম ক'বা সবেও শ্রেণী হিসেবে গরীব হ'য়ে যেতে থাকে। তার উপর আবার বেকার হ'য়ে গিয়ে যেটুকু তার সামান্য আয় তাও বন্ধ হয়ে যাবার ভয় থাকে।

এই সব কাৰণে শ্ৰমিকদেব মध्ये অসন্তোষ ক্ৰমেই বেড়ে যেতে থাকে। আৰু তাদেব একতাও বেড়ে যায়। প্ৰথম প্ৰথম তাৰা চাকৰিব জন্তু পবম্পৰেব সঙ্গে প্ৰতিযোগিতা কৰে। কিন্তু শীঘ্ৰেই দেখতে পায় যে তাদেব সকলেই সমান ছুখে ছুখী, তাদেব সকলেব ভাগ্যই এক স্মৃত্যে গাঁথা, তাৰা সকলেই সমান ভাবে কল মালিকদেব দ্বাৰা অত্যাচাৰিত ও শোষিত। কাজেই তাৰা একতাবদ্ধ হ'যে তাদেব সকলেব যে শত্ৰু, তাৰ বিৰুদ্ধে লড়বাৰ জন্তু প্ৰতিজ্ঞা কৰে। এমনি কৰে একদিকে যেমন তাদেব সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে তেমনি ক্যাপিটালিষ্টদেব সঙ্গে যুৰতে-যুৰতে তাদেব একতা বেড়ে যায়, তাদেব শ্ৰেণীচেতনা বেড়ে যায়। ক্ৰমে ক্ৰমে তাৰা দেখতে পায় যে উৎপাদন-যন্ত্ৰে তাদেব অধিকাৰ স্থাপন না কৰা অবধি তাদেব অবস্থাব সত্যিকাব প্ৰতিকাব সম্ভব নয এবং বাষ্ট্ৰ-ক্ষমতা না পাওয়া অবধি উৎপাদন-যন্ত্ৰে অধিকাৰ স্থাপন কৰা যায় না। তাই তাৰা তখন গভৰ্ণমেণ্ট দখল কৰাৰ চেষ্টা কৰে। বুৰ্জোয়া শ্ৰেণীৰ অনেকে বুৰ্জোয়া শ্ৰেণীৰ সত্যিকাব পৰিচয় পেয়ে তাদেব দল ছেড়ে শ্ৰমিকদেব দলে যোগ দেয়। কৃষক ও অন্যান্য উৎপাদিত শ্ৰেণীগুলোও এসে শ্ৰমিকদেব সঙ্গে যোগ দেয়। এমনি ক'ৰে তাৰা ক্ৰমেই শক্তিশালী হ'তে থাকে। ওদিকে বুৰ্জোয়া শ্ৰেণীও সম্ভবদ্ধ হ'তে থাকে। এই জন্তু সমাজে তীব্ৰ শ্ৰেণী-সংঘৰ্ষ উপস্থিত হয়। যে সব বুৰ্জোয়া দেশগুলোর

কলোনী আছে, সে সব বুর্জোয়া দেশে ক্যাপিটালিষ্টরা কলোনী লোকদের শোষণ ক'বে তাদের দেশের শ্রমিকদের তার এক অংশ দিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে। কিন্তু এ পন্থা বেশী দিন চলে না, কারণ কলোনীর লোকেবাও গরীব হয়ে পড়ায় কলোনীতেও মাল বিক্রী বন্ধ হ'য়ে যায়। তখন কলোনী থেকেও বিশেষ কিছু আয় হয় না। আব যে সব দেশের কলোনী নেই তারা ত এ উপায়ে শ্রমিকদের তুষ্ট ক'বতে পাবেই না। কাজেই শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে। তখন বুর্জোয়া খোলাখুলি ভাবে জোব প্রয়োগ ক'বে শ্রমিকদের ঠেঙ্গিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ক্যাপিটালিজমের এই রূপের নাম আমবা দেখেছি, ফ্যাসিজম। কিন্তু এ উপায়েও বেশী দিন শ্রেণী-সংগ্রাম বন্ধ বাখা যায় না। কারণ বোগের যে মূল-কারণ, অর্থাৎ ক্যাপিটালিজম, তা' দূর না হ'লে শুধু উপসর্গগুলোকে চেপে আব ক'দিন বন্ধ ক'বে বাখা যায়? তাই ক্যাপিটালিজমের সব লক্ষণগুলোই আবার প্রকাশ পেতে থাকে। ব্যবসা-সঙ্কট হ'তে থাকে, বেকাব-সংখ্যা বেড়ে যায়। এব ফলে শ্রেণী-সংগ্রাম আবার মাথাঝাঝা দিয়ে ওঠে। এমনি ক'রে শ্রেণী-সংগ্রাম চলতে চলতে এমন একটা সময় আসে যখন শ্রমিক-শ্রেণী ক্যাপিটালিষ্টদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ধ্বংস ক'রে দিয়ে তার জায়গায় সমাজের সকলের অধিকারে এগুলোকে নিয়ে

আসে এবং লাভের জন্ত পণ্য তৈরী না ক'রে সকলের ব্যবহারের জন্ত তৈরী ক'বতে থাকে। এক কথায় সোশ্যালিজম্ প্রতিষ্ঠা করে।

সোশ্যালিজমের পরিচয় :

ক্যাপিটালিজমের গোড়ার কথা যেমন উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার, তেমনি সোশ্যালিজমের গোড়ার কথা হ'ল উৎপাদন-যন্ত্রে সমাজের সকলের সমান অধিকার। সোশ্যালিষ্ট সমাজে প্রধান উৎপাদন-যন্ত্রগুলো ব্যক্তিবিশেষের থাকে না, জন-সাধারণের সম্পত্তি হয়। ক্যাপিটালিষ্ট সমাজে এই উৎপাদন-যন্ত্রগুলো তাদের মালিকদের লাভের জন্ত ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সোশ্যালিষ্ট সমাজে এগুলো সকলের সুবিধের জন্ত ব্যবহৃত হয়। ক্যাপিটালিষ্ট সমাজে জিনিস-পত্র তৈরী হয় উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকদের লাভের জন্ত। জন-সাধারণের অভাব মেটাবার জন্তে জিনিস-পত্র প্রধানতঃ তৈরী হয় না, প্রধানতঃ লাভের জন্ত তৈরী হয়। জিনিস-পত্র জনসাধারণের অভাব যদি মেটায় তবে সেটা কতকটা আকস্মিক ব্যাপারের মত। সোশ্যালিষ্ট সমাজে লাভের কথাই ওঠে না। জিনিস-পত্র সেখানে তৈরী হয়, যেহেতু এই সব জিনিস-পত্র মানুষের ভাল ভাবে বেঁচে থাকবার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক, সেই জন্ত। এক কথায়, ক্যাপিটালিষ্ট সমাজে জিনিস-পত্র তৈরী হয় লাভের জন্ত, সোশ্যালিষ্ট সমাজে তৈরী হয় ব্যবহারের জন্ত।

সোশ্যালিস্ট-সমাজে উৎপাদন :

এখন কথা হচ্ছে এই, সোশ্যালিস্ট-সমাজে কি ক'রে জিনিস-পত্র উৎপাদিত হয় ? ক্যাপিটালিস্ট-সমাজে উৎপাদন-যন্ত্রেব মালিকবা উৎপাদন-যন্ত্র ব্যবহার ক'বে পণ্য তৈরী করে, কাবণ তাতে তাদেব লাভ হয় যথেষ্ট এবং সেই সব জিনিসই তাবা তৈরী কবে, যেগুলোতে তারা লাভেব আশা বাখে। কিন্তু সোশ্যালিস্ট-সমাজে এই উৎপাদন-যন্ত্রগুলো কাবা চালু কববে এবং কি কি জিনিস তৈরী কবা হবে, তাই বা কি ক'বে ঠিক ক'ববে ? তোমাদেব আগে বলেছি, কশ দেশে গত মহাযুদ্ধেব সময়ে ১৯১৭ সালেব অক্টোবর মাসে এক বিপ্লব হয় এবং এই বিপ্লবেব ফলে শ্রমিকবা সেখানে ক্ষমতা পেয়ে ধীবে ধীবে সোশ্যালিজম্ স্থাপন কবে। ওদেব দেশে কিবকম ভাবে জিনিস-পত্র তৈরী হয়, তা জানলেই সোশ্যালিস্ট-সমাজে কিবকম ভাবে জিনিস-পত্র তৈরী হয়, তা জানা যাবে। সোভিয়েটে আইন তৈরী কবাব যে সভা আছে, সেই সভা থেকে কযেকজন নিয়ে, কযেকজন ইঞ্জিনিয়ার ও অগ্নাত্ত লোক—যাঁবা এ-সব ব্যাপার ভাল বোঝেন—তাদেব নিয়ে ও শ্রমিকদেব পক্ষ থেকে কযেকজনকে নিয়ে একটা কমিটি-গোছের কবা হ'য়েছে। এব নাম হ'ল “কেন্দ্রীয় প্লানিং কমিশন।” সংক্ষেপে একে বলা হয় “গস্প্লান্।” এই গস্প্লান্ দেশে কত কাঁচা-মাল তৈরী হ'তে পারে, কত শ্রমিক আছে কত ইঞ্জিনিয়ার আছে,

উৎপাদন-যন্ত্রের পরিমাণ বত, ইত্যাদির একটা মোট হিসেব কবে। তাব পবে, তাব আগেব আগেব বছব কোন জিনিস বত তৈবী হ'যেছিল, কোন জিনিস লোকেবা বত বেশী পবিমাণে চায়, কোন জিনিস লোকদেব বেশী পছন্দ-এই সব খোঁজ-খবব ক'বে, কি কি জিনিস আস্ছে বছব দবকাব হবে এবং কতটা দবকাব হবে, তাব একটা হিসেব কবে। তাবপবে যতটা উৎপাদন-যন্ত্র তাদেব আছে এবং যতগুলো জিনিস-পত্র দবকাব হবে তাব ভেতব একটা সামঞ্জস্য বেখে আসছে পাঁচ বছব কোন কোন কাবখানায় বা কৃষিফার্মে কতটা জিনিস তৈবী ক'বতে হবে তাব একটা “প্লান” বা পবিকল্পনা তৈবী কবে। এটাকে বলে “ড্রাফ্ট প্লান” বা প্লানেব খসড়া। এই ড্রাফ্ট প্লান তাবপব প্রাত্যেক জেলায় “গস্প্লানেব” যে শাখা আছে, তাদেব কাছে পাঠিয়ে দেয। তাবা এটাকে ভাল ক'বে পবীক্ষা ক'বে দেখে, কোথাও কোন ভুল আছে কিনা, কোনও জিনিস তাবা আবও বেশী ক'বে সেই জেলা থেকে তৈবী ক'বতে পাবে কিনা বা কোনও জিনিস তাদেব যা ক্ষমতা তাব চেয়ে অনেক বেশী তৈরী ক'বতে বলা হ'যেছে কিনা। এই বকম ভাবে জেল প্লানিং কমিশনগুলো তাদেব মতামত জুড়ে দিয়ে সেগুলোবে

১ সব কাবখানায় কাবখানায় বা কৃষিফার্মে পাঠিয়ে দেয কাবখানার শ্রমিকদেব পক্ষ থেকে হ'একজন কারখানাব ম্যানেজার ও ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে আবার একটা ফ্যাক্টরী-কমিটি

বসে। সেই ফ্যাক্টরী-কমিটি তাদের কত জিনিস তৈরী করার
 ভাব দেওয়া হ'য়েছে, এবং কি কি কাঁচা-মাল, যন্ত্রপাতি
 ইত্যাদি দেওয়া হ'য়েছে, এই সব দেখে তাদের মতামত ব্যক্ত
 ক'বে সকল শ্রমিকদের একটা মিটিং হবে। সেখানে
 শ্রমিকদের ভেতর খোলাখুলি ভাবে সব আলোচনা হয়।
 শুধু যে শ্রমিকদের সভায় এই পঞ্চবার্ষিক প্লানের খসড়া
 আলোচিত হয় তা নয়, খবরের কাগজে এই সময় তুমুল
 আলোচনা চলতে থাকে এই প্লান নিয়ে। এই বিষয়ে যার
 যত আপত্তি আছে, বা বলবার কিছু আছে, সব খবরের
 কাগজ মাঝে মাঝে বা শ্রমিকদের এই খোলা মিটিংএ বলতে
 পাবে। এই সব উৎপাদিত জিনিস-পত্র ব্যবহার কবে যারা,
 তাদের পক্ষ থেকেও আলোচনা হয় এবং তাবাও নানা বকম
 প্রস্তাব ও পৰামর্শ দেয়। এমনি ভাবে শ্রমিকদের খোলা
 মিটিংএ সে আলোচনা শেষ হবার পর শ্রমিকদের মতামত যোগ
 ক'বে দিয়ে ড্রাফট-প্লানটা তারা ফেবত পাঠায় জেলা প্লানিং
 কমিশনের কাছে। তাবা আবার পাঠিয়ে দেয় গস্প্লানের
 কাছে, গস্প্লান তখন সেই সব মতামত বিচার ক'বে একটা
 শেষ ড্রাফট প্লান-বচনা করে এবং সেটা আইন-সভার কাছে
 বাখে। আইন-সভা সেটা নিয়ে আলোচনা ক'বে কিছু
 অদল-বদল ক'বে সেটা পাশ ক'বে দেয়। তখন সেই প্লান
 অনুযায়ী দেশে জিনিস-পত্র তৈরী হ'তে থাকে।

অনেকের ধারণা সোস্যালিস্ট-সমাজের যাবা কর্তৃকর্তা,

তারা যা বলেন জন-সাধারণকে তাই ক'রতে হয়। তারা যদি বলেন, মেয়েরা সব লাল-শাড়ী পাবে, কেউ নীল-শাড়ী পবতে পাবে না, তাহ'লে লাল-শাড়ী ছাড়া আব কোন রকম শাড়ী তৈরী হবে না। কাজেই বাধ্য হ'য়ে ভাল না লাগলেও সবাইকে লাল-শাড়ী পবতে হবে। প্লান কি বকম ভাবে তৈরী হয়, তা যদি বুঝে থাক, তা হ'লে এ-ধাবণা যে ভুল তা আব আলাদা ক'বে বুঝিয়ে বলতে হবে না। কেন না এই প্লান তৈরীক সময় সবাই তাদের মতামত ব্যক্ত কবাব সম্পূর্ণ সুযোগ পায়। কাজেই তখন ব্যবহাবকাবীদের সভায় বা খবর-কাগজ মাফক শুধু লাল-শাড়ী তৈরীক বিরুদ্ধে যে সব মেয়েবা, তারা তাদের প্রতিবাদ জানাবে। এই প্রতিবাদেব ফলে অত্নাত্ন বংয়ের শাড়ীও তৈরী হ'বে। এমনি ভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সম্পূর্ণরূপে জন-সাধাবণের মতামত নিয়ে জিনিস-পত্র তৈরী হ'তে থাকে।

সোভিয়েট দেশে সব বড় বড় কাবখানাগুলোই গভর্ণ-মেন্টেব হাতে এবং গভর্ণমেন্টেব অনেক কৃষি-ফার্মও আছে। এ ছাড়া যে সব শ্রমিক গভর্ণমেন্টেব কাবখানায় কাজ ক'বতে চায় না, তাবা তাদের নিজেদের কো-অপারেটিভ কাবখানা খুলতে পাবে। এই বকম অনেক কো-অপারেটিভ কাবখানাও ওদেশে আছে। এ-গুলোকে ওরা বলে 'ইনকপ্‌স্' (Incops) কৃষকবাও আবাব নিজেব নিজেব জমি চাষ ক'বতে পারে বা অনেকে মিলে "ঘুক্তফার্ম" (Collective Farms) খুলতে

পারে। এ-শুল্ককে ওরা বলে 'কোল্‌থস্' (Kolkhos) এই সব ইন্‌কপ্‌স্ বা কোল্‌থস্ তাদের নিজেদের পণ্য নিজেরাই বাজারে বিক্রী ক'রতে পাবে এবং ক্রেতাবাও যেখান থেকে ইচ্ছা কিনতে পাবে। কাজেই দেখতে পাচ্ছ মোভিয়েট দেশে উৎপাদন-প্রণালীর কোথাও জোব ক'রে কিছু ক'রা হয় না। ব্যাপাবটা সম্পূর্ণ জনসাধারণের স্বাধীন ইচ্ছাব উপর নির্ভর কবে ও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক।

প্ল্যানিংয়ের ফল :

ব্যবহারের জন্য জিনিস-পত্র তৈরী হয় বলে এবং প্লান ক'বে সব তৈরী হয় বলে ক্যাপিটালিষ্ট্ উৎপাদন প্রথায় যেসব গোলমাল দেখা যায়, সোশ্যালিষ্ট্ উৎপাদন প্রথায সেগুলো আব থাকে না। ধন সম্পত্তি যা তৈরী হয় তাব কিছুটা গভর্নমেন্ট দেশের শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা ক'রার জন্য ও উৎপাদন-যন্ত্র আবও বাডান এবং গভর্নমেন্ট চালাবার খরচা হিসেবে বাদ দিয়ে বাকীটা সব জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন ক'বে দিতে পাবে। কারণ জিনিস-পত্র ত আব এখানে লাভের জন্য তৈরী হয় না যে, লাভ না হ'লে আব বিক্রী না ক'বে গুদামে বন্ধ ক'বে রাখা হবে বা নষ্ট ক'বে দেয়া হবে ৭ এই জন্য সোশ্যালিষ্ট্-সমাজে কখনও অবিক্রীত জিনিসে বাজার বোঝাই হ'য়ে থাকে না এবং তাব পাশেই লোক না খোত পেয়ে, না পবতে পেয়ে মা'বা যায না। জিনিস-পত্র তৈরী হ'তে না হ'তেই লোকে তা কিনে নেয়। এব ফলে

কখনও ব্যবসা-সঙ্কট দেখা দেয় না। কাবখানা দিনরাত চালু বেখেও লোকেব অভাব মেটান কষ্টকর হয়। শ্রমিকবা কখনও বেকাব হয় না। তাদের অবস্থাব উন্নতি হ'তেই থাকে। এই জন্ত গত ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল অবধি যখন সমস্ত ক্যাপিটালিষ্ট-দেশগুলো ব্যবসা-সঙ্কটে ধ্বসে পড়বার উপক্রম হ'য়েছিল, সোভিয়েট দেশে তখন দিনবাত কাজ ক'বেও তাদের কারখানাগুলো লোকেব চাহিদা মেটাবার মত যথেষ্ট জিনিস তৈরী ক'বে উঠতে পারছিল না। সমস্ত পৃথিবীতে যখন লক্ষ লক্ষ লোক বেকাব হ'য়ে যাচ্ছিল, তখন সোভিয়েট দেশে শ্রমিকেব অভাবে কাবখানা আবও বাড়ান যাচ্ছিল না।

সোশ্যালিষ্ট-প্রণালীতে জিনিসপত্র তৈরী হবার আব একটা বড় সফল হচ্ছে এই যে, জিনিসপত্র দেশেব বাজাবে অবিক্রীত হ'য়ে প'ড়ে থাকে না বলে জিনিস বিক্রীত জন্ত কলোনীও দবকাব হয় না। সেই জন্ত সোশ্যালিষ্ট-দেশ-গুলোকে কলোনীও জন্ত অপব দেশেব স্বাধীনতা নষ্ট ক'বে তাদের শোষণও ক'রবার দবকাব হয় না। আব কলোনীও দবকাব হয় না বলে কলোনীও জন্ত যুদ্ধেবও দবকাব হয় না। এই জন্ত যুদ্ধ দূর কবার প্রধান উপায় হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদ।

সমাজতন্ত্রবাদের আমলে মানুষেব যে শুধু আর্থিক সুবিধা হয় তা নয়, সব দিক দিয়েই তাব সুবিধা হয়। শিক্ষা দীক্ষাব তাব বাধা নেয় এবং স্ত্রী, পুরুষ সবাই শিক্ষা লাভ কবার সম্পূর্ণ ও সমান সুযোগ পায়। এর ফলে, দাবিজ্যের চাপে এখন

যে বকম অনেক ভাল ভাল ছেলের মেধা নষ্ট হ'য়ে যায়, সে বকম হ'তে পাবে না। শিক্ষা লাভ ক'বে প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের বিশেষ যে সব ক্ষমতা বা প্রতিভা তা ফুটিয়ে তুলবার যথেষ্ট সুযোগ পায়। এব ফলে মানুষ সত্যি সুখী হ'তে পাবে এবং নিজের জীবন সার্থক ক'বে তুলতে পাবে। এই বকম সবাই সমান সুযোগ পায় বলে সোশ্যালিস্ট্ সমাজেই মানুষ সত্যিকার স্বাধীনতা পায়।

এব একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত সোভিয়েট সমাজের একটা ঘটনা থেকে তোমাদের বলছি। একটা কাবখানায় একটা মেয়ে কাজ ক'বত। কিন্তু কাবখানার কাজে তার কোন উৎসাহই ছিল না। বার বার সে কাজে ভুল ক'বত এবং যতখানি কাজ তাকে দেওয়া হ'ত তা সে কিছুতেই ক'বে উঠতে পা'রত না। কারখানার ম্যানেজার তাকে শোধবাবার অনেক চেষ্টা ক'বল। এক বিভাগ থেকে সবিয়ে নিয়ে অন্য বিভাগে দিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। অবশেষে হতাশ হ'য়ে শ্রমিক-সংঘের কাছে তাকে অন্য কাবখানায় পাঠিয়ে দেবার অনুবোধ ক'বে পাঠাল। শ্রমিক-সংঘ মেয়েটিকে একটি মানসিক চিকিৎসাগারে পাঠিয়ে দিল। সেখানে পরীক্ষা ক'বে দেখা গেল যে, মেয়েটির মনের গঠন এ বকম যে, সে কাবখানায় কাজ কববার সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং শিক্ষার কাজ সে ভাল পাববে। শ্রমিক-সংঘ তখন তাকে একটা স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজ খুঁজে দিল। দেখা গেল যে,

শিক্ষয়িত্রী হিসাবে সে খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ ক'রে বেশ নাম ক'বে ফেলল। এ রকম ভাবে প্রত্যেকটি মানুষের মনের সম্পূর্ণ বিকাশ হ'বার সুযোগ ক'বে দেওয়ার দৃষ্টান্ত একমাত্র সোস্যালিস্ট-সোভিয়েটেই পাওয়া যাবে।

আব একটা ঘটনা বলছি। একদিন এক জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে একজন কাঠুবিয়ার পায়েব উপর একটা গাছ প'ড়ে তাব পাটা জখম হ'য়ে যায় এবং খুব রক্তপাত হ'তে থাকে। লবীতে ক'বে তৎক্ষণাৎ তাকে সহবেব হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ততক্ষণ তাব এত বেশী রক্ত ক্ষয় হ'য়ে গেছে যে তাব শরীবে অবিলম্বে রক্ত না দিলে তাকে আব কোনমতেই বাঁচান যাবে না। কিন্তু এই ছোট্ট সহবেব হাসপাতালে তাব শরীরেব উপযুক্ত রক্ত ছিল না এবং এত শীঘ্র রক্ত অশ্রু কাবও শরীর থেকে নিয়ে পবীক্ষা ক'বে দেখবারও সময় ছিল না। তৎক্ষণাৎ বেতাবে বড় সহবে খবর পাঠান হ'ল জমাট রক্ত পাঠাতে। কয়েক মিনিটেব ভেতর সহবেব ওপর একটা এবোল্পেন দেখা গেল এবং এই এবোল্পেনটা থেকে ছোট্ট একটি প্যাবাস্ট্রেটে এক শিশি জমাট রক্ত নেবে এল। ডাক্তার এই জমাট রক্তটা কাঠুবিয়ার শরীরে প্রবেশ কবিয়ে দিলেন, কাঠুবিয়া বেঁচে গেল। প্রত্যেক মানুষের জীবনকে সোস্যালিস্ট সমাজে এত মূল্যবান ব'লে মনে কবা হয়। আমাদের মত দেশে শত শত লোক অনাহারে বাস্তার ধারে মবে পড়ে থাকলেও লোকে ক্রক্ষেপ

কবে না। যে সমাজ, প্রত্যেকটি লোকের জীবনকে এতখানি মূল্য দেয় সে সমাজ নিশ্চয়ই আমাদের মনে আশাব সঞ্চার কবে।

[পাঁচ]

সোশ্যালিজম্ ও কম্যুনিজম্ বা সাম্যবাদ

এতক্ষণ আমরা শুধু কি ক'বে সোশ্যালিষ্ট-সমাজে জিনিস-পত্র তৈরী হয় তাই দেখেছি। কিন্তু কি ক'বে এই সব তৈরী জিনিসপত্র লোকদের ভেতর বণ্টন করা হয়, তা আমরা দেখিনি। কাবখানাগুলোয় যে সব জিনিসপত্র তৈরী হয়, সেগুলো না হয় বাজারে নিয়ে যাওয়া হ'ল লোকদের কাছে বিক্রী ক'রবার জন্য। কিন্তু লোকের পকেটে যদি পয়সা না থাকে, তবে লোকে কিনবে কি ক'বে? লোকদের পকেটে পয়সা আসে কি ক'বে, অর্থাৎ তাদের আয় হয় কি ক'বে তা আমরা এখনও দেখিনি। এবাব তাই তোমাদের একটু বলব।

ক্যাপিটালিষ্ট-সমাজে লোকের আয় দু'বকম ভাবে হ'তে পারে। এক হ'তে পারে পবিশ্রম ক'বে। শরীর খাটিয়ে বা মস্তিষ্কের পবিশ্রম ক'বে লোকে কিছু আয় ক'দতে পারে। মজুরবা, কেবাগীবা, শিক্ষকবা, গভর্নমেন্ট-অফিসারবা, উকিলরা, ডাক্তারবা এই বকম শরীর বা মাথা খাটিয়ে আয় করে।

আর আয় হ'তে পাবে সম্পত্তি থেকে। কাবও যদি কোন উৎপাদন-যন্ত্র থাকে, তবে সেই উৎপাদন যন্ত্র অপবকে ব্যবহার ক'বতে দিয়ে আয় হ'তে পাবে। সময় সময় উৎপাদন-যন্ত্রেব মালিক অপবকে উৎপাদন-যন্ত্র না দিয়ে নিজেই তা খাটায়। সে ক্ষেত্রে উৎপাদন-যন্ত্রে ভাড়া হিসেবে ত কিছু পায়ই, উপরন্তু উৎপাদন-যন্ত্র ব্যবহার ক'বে যা লাভ হয় তাও পায়। জমিদার, মহাজন, ব্যাঙ্কার, কল মালিক, ক্যাপিটালিষ্ট্ প্রভৃতি লোকেবা এই ভাবে সম্পত্তি থেকে আয় কবে। পবিশ্রম ক'বে যে আয় হয়, তাব চেয়ে সম্পত্তি থেকে আয়েব পবিমাণ অনেক বেশী। এই জন্তে দেখাব, ক্যাপিটালিষ্ট্ সমাজে সবাই টাকা পয়সা জমিয়ে সম্পত্তি ক'বাব জন্তে ব্যস্ত। কাবণ সম্পত্তি থাকলে বসে বসে কোন কাজ না ক'বে যথেষ্ট আয় কবা যায়। এমন কি কোন কাজ না ক'বে যাব যত বেশী আয়, ক্যাপিটালিষ্ট্ সমাজে তাব তত বেশী মান। সবাই তাকে দেখলেই সেলাম চৌকে, বিশেষ সমীহ ক'বে চলে। ক্যাপিটালিষ্ট্ সমাজে বিড়াই বল আব বুদ্ধিই বল বা অন্য কোন ভাল গুণ বল, টাকা না থাকলে এ সব গুণেব কোন মর্যাদাই দেওয়া হয় না। এই জন্ত সবাই ক্যাপিটালিষ্ট্ হ'তে চায়।

সোশ্যালিষ্ট-সমাজে আয়েব দ্বিতীয় উপায় নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার নষ্ট হ'য়ে যায় ব'লে সম্পত্তি ভাড়া দিয়ে বসে বসে খাবার আর

উপায় থাকে না। সবাইকে পবিত্রম ক'বে কাজ ক'বে
 খেতে হয়। পবিত্রম যে না করে, সোস্যালিস্ট-সমাজে
 তার ভাত জোটে না। মাথাব পরিশ্রমই হোক, আর
 গতব খাটিয়েই হোক, পবিত্রম সবাইকে ক'বতেই হয়।
 বসে বসে আবামে খাওয়া যায় না বলে ক্যাপিটালিস্টবা ও
 সম্পত্তিওয়ালা লোকেবা তাই সোস্যালিজমের এত বিবোধী।
 এখন প্রশ্ন ক'বতে পাব, কেউ যদি কাজ না পায়, তা হ'লে
 সে কি ক'বে খাবে? ক্যাপিটালিস্ট-সমাজে অনেকে বেকার
 থাকে। আবাব যাবা চাকরি কবে, যে কোন মুহূর্তে তাদের
 চাকরি চ'লে যেতে পারে। চাকরি চ'লে গেলে লোকের
 দুঃখ-কষ্টের একশেষ হয়, না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হয়।
 কাজেই সবাই চাকরি যাওয়ার বড় ভয় কবে এবং চাকরি
 গেলে যাতে কষ্টে না পড়তে হয়, তার জন্ত বাধ্য হ'য়ে কিছু
 জমাবাব চেষ্টা কবে। সোস্যালিস্ট-সমাজে কিন্তু চাকরি না
 পাবার বা চাকরি যাবার কোন ভয় থাকে না। কেন না,
 উৎপাদন-যন্ত্রে সকলেবই অধিকার থাকে ব'লে সবাই সেই
 উৎপাদন-যন্ত্র ব্যবহার ক'বে কিছু আয়েবও অধিকারী হয়।
 সোস্যালিস্ট-সমাজে, আমবা আগে দেখেছি, লোকের অবস্থা
 দিন দিন ভাল হতে থাকে বলে জিনিস-পত্রের চাহিদা
 খুব বেড়ে যেতে থাকে। সেইজন্ত উৎপাদন-যন্ত্র বেশী বেশী
 ক'বে খাটাতে হয়, এবং তার জন্ত লোকজনেরও দরকার
 থাকে সব-সময়। কাজেই “এই কাবখানায় লোক দরকার

নেই” এ-রকম নোটিশ—যা ক্যাপিটালিষ্ট-দেশের কাবখানা-
 গুলোতে প্রায়ই বুলান দেখা যায়—সোশ্যালিষ্ট-দেশের
 কাবখানায় থাকে না। তাবপবে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষকরা
 পবীক্ষা ক’বে দেখে, কোন ছেলে বা মেয়েব কোন্ দিকে
 বেশী ঝোঁক আছে। তাকে সেই বকম শিক্ষা দিয়ে, শিক্ষা
 শেষ হ’বাব পব সেই কাজে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।
 যেমন দেখা গেল, একটি ছেলের ইঞ্জিনিয়াবিংয়েব দিকে
 ঝোঁক আছে, তাকে তখন ইঞ্জিনিয়াবিং শেখান হ’ল এবং
 শিক্ষাব পব এক কাবখানায় ইঞ্জিনিয়াব করে দেওয়া হ’ল।
 এই জন্তে সোশ্যালিষ্ট-দেশে কেউ বেকাব থাকে না। আব
 কেউ বেকাব হয় না। কেন না, মনে কব, কোন এক
 কাবখানায় ম্যানেজাবেব সঙ্গে কোন সাধাবণ ঞ্মিকের
 ঝগড়া হল। ক্যাপিটালিষ্ট-দেশ হ’লে ঞ্মিককে তৎক্ষণাৎ
 বিদায় নিতে হ’ত। কিন্তু সোশ্যালিষ্ট-দেশে এই ঝগড়া
 ফ্যাক্টবী-কমিটিব কাছে যাবে বিচাবেব জন্ত। ফ্যাক্টবী-
 কমিটিতে ঞ্মিকদের মধ্য থেকে কযেকজন ও ম্যানেজাবেব
 পক্ষ থেকে কযেকজন লোক থাকে। তাবা যদি দেখে
 ম্যানেজার দোষী তাহলে ম্যানেজাবেকে শাসন কবে, আব
 মজুব দোষী হ’লে তাকে শাসন কবে। আব যদি প্রমাণিত
 হয় যে, সে মজুব এই কাবখানাব কোন কাজেবই উপযুক্ত
 নয়, তা হ’লে তাকে ঞ্মিক-সঙ্ঘের (Trade Union)
 কর্মকর্তাদের কাছে পাঠান হয়। তাবা সে যে কাজেব

উপযুক্ত, সেই বকম কাজ খুঁজে তাকে লাগিয়ে দেয়। এই জন্তে সোশ্যালিষ্ট-দেশে কেউ বেকাব হয় না।

এ-ছাড়া কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে “অসুস্থতার ভাতা” (Sick Insurance Benefit) দেওয়া হয় এবং চিকিৎসার সব বন্দোবস্ত ক’বে দেওয়া হয়। বুড়ো হলে সবাই পেন্সন পায়। কাজেস না খেয়ে মরবার ভয় আর সোশ্যালিষ্ট-দেশে থাকে না। এই জন্ত পুঁজি ক’ববারও দবকাব হয় না।

অনেকেব ধাবণা, সোশ্যালিষ্ট-দেশে সকলেব সমান মাইনে। এ-ধাবণা অত্যন্ত ভুল। সমান মাইনে দেওয়া সম্ভবও হয় না, এবং আয়েব দিক থেকে উচিতও নয়। সম্ভব হয় না এই জন্ত যে কঠিন পৰিশ্রম ক’বে কেউ যদি কম পৰিশ্রম যে কবে তাব সমান মাইনে পায়, তবে কঠিন পৰিশ্রম কেউ ক’বতে চাইবে না। এর ফলে জিনিস-পত্র উৎপাদন হবে না ঠিক মত। আবার এ-বকম নিয়ম অগ্রাযও হবে। মনে বব, দু’জন লোক সমান মাইনে পাচ্ছে। একজন লম্বা-চওড়া মস্ত জোয়ান, আর একজন বেঁটেও বোগা। যে জোয়ান, তাব খাওয়া বেশী দবকাব হবে, পরা বেশী দবকাব হবে, সব কিছু তাব বেঁটে লোকটার চেয়ে বেশী লাগবে। এদেব দু’জনকে যদি সমান মাইনে দেওয়া হয়, তা হ’লে পালোয়ানের উপর অগ্রায করা হবে। সেই জন্তে সোশ্যালিষ্ট-সমাজে সবাইকে

সমান মাইনে দেওয়া হয় না। যাব যে-বকম কাজ, তাকে সেই বকম মাইনে দেওয়া হয়। তবে এটা সত্যি যে, ক্যাপিটালিষ্ট-সমাজে যেমন কেউ কেউ হাবভাজা খাটুনি খেটে খুব কম মাইনে পায়, আর কেউ শুধু দু'একটা সই দিয়ে তাব চেয়ে হাজার-হাজার-গুণ বেশী মাইনে পায়, এ-বকম বেশী তাবতম্য থাকবে না। সব চেয়ে বেশী মাইনে এবং সব চেয়ে কম মাইনের মধ্যে যে পার্থক্য তা ক্যাপিটালিষ্ট-সমাজ থেকে খুব কম হবে।

কম্যুনিষ্ট-সমাজ :

ফিউডাল-সমাজ থেকে জন্ম নিয়েছে ক্যাপিটালিষ্ট-সমাজ, ক্যাপিটালিষ্ট-সমাজ থেকে জন্ম নেবে সোশ্যালিষ্ট-সমাজ, এবং সোশ্যালিষ্ট-সমাজ উন্নত হ'তে হ'তে কম্যুনিষ্ট-সমাজে কপান্তবিত হবে। কম্যুনিষ্ট-সমাজটা কি বকম হবে? কম্যুনিষ্ট-সমাজে সোশ্যালিষ্ট-সমাজের মতই প্র্যান ক'বে জিনিস-পত্র তৈরী হবে। কিন্তু বণ্টনের নিয়মটা বদলে যাবে। সোশ্যালিষ্ট-সমাজে বণ্টনের নিয়ম হচ্ছে, যে যে-রকম কাজ কবে, সে সেই রকম আয় করে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট-সমাজে আয়ের নিয়ম হবে, আবশ্যকতা অনুযায়ী আয়। যাব যে-বকম জিনিস-পত্রের দরকাব সে সেই রকম পাবে। ক্যাপিটালিষ্ট-সমাজে থেকে থেকে মানুষের আত্মরক্ষার জন্যই ভয়ানক স্বার্থপব হ'তে হয়। স্বার্থপব না হ'লে ক্যাপিটালিষ্ট-সমাজে বেঁচে থাকা কষ্টকব হয়। মানুষের

মন এই বকম স্বার্থপৰ থাকাব জ্ঞাত সোশ্চালিষ্ট-সমাজেও আবশ্যকতা-অনুযায়ী বণ্টনেৰ নিয়ম কাজে লাগান যায় না। কাৰণ, তাহলে লোকে কাজ-কৰ্ম কিছু না কৰে স'ব জিনিস পত্ৰ নিজেদের দরকাৰ ব'লে ভোগ ক'বতে চাইবে। সোশ্চালিষ্ট-সমাজে থেকে থেকে, সোশ্চালিষ্ট শিক্ষাব ফলে মানুষেৰ মন যখন যথেষ্ট উন্নত হবে ও ব্যক্তি-স্বার্থ থেকে সমাজেৰ স্বার্থ বড় ক'বে দেখতে শিখবে এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতিৰ ফলে যখন সমাজেৰ উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট পৰিমাণে বেড়ে যাবে, তখনই আবশ্যকতা-অনুযায়ী বণ্টনেৰ নিয়ম কাজে লাগান যাবে। তাৰ আগে সম্ভব হবে না।

কম্যুনিষ্ট-সমাজেৰ সঙ্গে সোশ্চালিষ্ট-সমাজেৰ দ্বিতীয় পার্থক্য হ'ল এই যে, কম্যুনিষ্ট-সমাজে রাষ্ট্র থাকবে না। আমবা দেখেছি, সমাজে শ্ৰেণী থাকলেই বাষ্ট্র থাকে। এক শ্ৰেণী অন্য শ্ৰেণীকে শাসন ক'ববাব জ্ঞানই বাষ্ট্র ব্যবহার কৰে। সোশ্চালিষ্ট-সমাজে ধীবে ধীবে শ্ৰেণীগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে। উৎপাদন-যন্ত্ৰে সকলেৰ অধিকাব থাকবে এবং ক্ষমতা থাকলে সবাই সমাজেৰ যে-কোন কাজ ক'রতে পাববে। এমনি ভাবে সুযোগ সবাই সমান পাবে ব'লে শ্ৰেণী আৰ থাকবে না। ছোট লোক বড়লোক বলে, উঁচু নীচু বলে, মানুষে মানুষে কোন বিভেদ আৰ থাকবে না। শ্ৰেণী যখন ধীবে ধীৰে লোপ পেতে থাকবে, তখন রাষ্ট্ৰেবও আৰ আবশ্যকতা কিছু থাকবে না। রাষ্ট্রও ধীৰে ধীৰে

লোপ পেযে যাবে। তখন আইন-কানুন সবাই মিলে ক'ৰবে, এবং সবাই তা স্বেচ্ছায় পালন ক'ৰবে। তাৰ জন্ত পুলিশ, গুপ্তচৰ, সৈন্ত, কয়েদখানাব কিছু দৰকাৰ হ'বে না। জোর দেখাবাব কোন আবশ্যকতাই থাকবে না। তখন বাঙালীৰ জাৰগায় “জন-সাধাৰণৰ কমিটি” গোছেৰ একটা থাকবে মাত্ৰ।

সমস্ত পৃথিবীৰ ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলো মিলে তখন শুধু একটা মাত্ৰ দেশ ক'ৰবে। এই বকম হ'বে কম্যুনিষ্ট-সমাজ।

[ছয়]

ডেমোক্ৰাসী বা গণতন্ত্ৰ

ৰাজ্য যেখানে আইন তৈৰী কৰে এবং দেশ শাসন কৰে, সেখানকাৰ গভৰ্ণমেণ্টকে বলা হয় ‘ৰাজতন্ত্ৰ’। আৰু যেখানে জন-সাধাৰণ বা জন-সাধাৰণৰ দ্বাৰা মনোনীত লোকেবা আইন তৈৰী কৰে ও দেশ শাসন কাৰ, সেখানকাৰ গভৰ্ণমেণ্টকে বলা হয় ‘গণতান্ত্ৰিক’-গভৰ্ণমেণ্ট। গণতন্ত্ৰ এই ধাৰণাৰ উপৰ স্থাপিত যে, দেশেৰ গভৰ্ণমেণ্ট সকলেৰ মত নিয়ে কৰা উচিত, এবং আইন-কানুনও সকলেৰ মতামত নিয়ে বচনা কৰা উচিত। কাৰণ গণসাধাৰণেৰ মতামত না নিয়ে যদি আইন-কানুন তৈরী

হয় বা দেশ শাসন করা হয়, তা হ'লে যাবা দেশ শাসন কবে এবং আইন তৈরী কবে, তাবা তাদের স্বার্থেব জন্তাই আইন-কানুন তৈরী ক'ববে এবং দেশ শাসন ক'ববে। জন-সাধাবণেব স্বার্থেব দিকে তাবা দৃষ্টি দেবে না। কাজেই এ-বকম শাসনেব ফলে গণসাধাবণেব উপেব অজ্ঞায়, অবিচার, হবাব খুব সম্ভাবনা থাকে এবং তাদের স্বাধীনতা লোপ পায়। কাজেই গভর্ণমেন্ট জন-সাধাবণেব মত নিয়ে করা উচিত।

বর্তমানে যে সব ডেমোক্রাটিক দেশ আছে এ-গুলোকে 'বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক' দেশ বলা হয়। এগুলো সব ফরাসী-বিপ্লবেব সময়ে স্থাপিত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী যখন দেখল যে, তাবা সংখ্যায় খুব কম হওয়ায় ফিউডাল বা জমিদাবশ্রেণীেব হাত থেকে ক্ষমতা একা একা নিয়ে নিতে পাবে না, তখন "সব মানুষ সমান", "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য" ইত্যাদি বুলি আউডে শ্রমিক-কৃষকদের সাহায্য লাভ কবে। কিন্তু ক্ষমতা যখন তাবা পেল, তখন এ-সবগুলো সত্যি ক'বে কাজে লাগাবাব জন্ত তাদের তেমন উৎসাহ বইল না। শুধু শ্রমিক ও কৃষকদের চাপে প'ড়ে আইনেব চক্ষে সবাই সমান ব'লে কর্তব্য শেষ ক'বল। গভর্ণমেন্টও আব কোন একজনেব হাতে বইল না। ভোট দিয়ে প্রতিনিধি মনোনয়ন ক'বে সেই প্রতিনিধিদের দিয়ে গভর্ণমেন্টেব কাজ চালান হ'তে লাগল। কিন্তু

আইনেব চক্ষে সবাই সমান হ'লে কি হবে, কাজেব বেলা ক্ষমতা বুজ্জোয়া-শ্রেণীব হাতেই থেকে গেল। কাবণ উৎপাদন-যন্ত্র তাদেব হাতে থেকে যাওয়ায, তাদেব মুখ চেয়েই শ্রমিক কৃষকদেব থাকতে হ'ল। এমন কিছু শ্রমিক কৃষক ক'বতে সাহস পেল না, যাতে বুজ্জোয়াবা অসন্তুষ্ট হ'য়ে তাদেব চাকরী খুইয়ে দেবে। তাবপবে খববেব কাগজগুলোও সব বুজ্জোয়াদেব হাতেই থেকে গেল। এব ফলে, শ্রমিক ও কৃষকদেব বিপথে নিয়ে গিয়ে নিজেদেব স্বার্থ-সিদ্ধি কবিয়ে নেবাব কোন অনুবিধা থাকল না। শ্রমিক-কৃষকদেব এমন কিছু শিক্ষা দীক্ষা দেবাব সুবিধা কবা হ'ল না, যাতে তাবা গভর্নমেণ্টেব কাজ-কর্ম নিজেবাই চালিয়ে নিতে পাবে। কাজেই সব দিক থেকেই এবা বুজ্জোয়াদেব মুখ চেয়ে তাদেব অধীন হ'য়ে রইল। এইজন্ত বর্তমান ডেমোক্রাসীগুলোতে আইনত যদিও সবাই সমান হ'ল, যদিও সবাই স্বাধীন হ'ল, কিন্তু আসলে সমস্ত ক্ষমতা বুজ্জোয়াদেব হাতেই থেকে গেল। সেই জন্ত বর্তমান ডেমোক্রাসীকে সত্যিকার ডেমোক্রাসী বলা চলে না।

সত্যিকার ডেমোক্রাসী স্থাপন ক'রতে হ'লে, উৎপাদন-যন্ত্রে সকলের সমান-অধিকার দেওয়া দরকাব। কাবণ তা না হ'লে, উৎপাদন-যন্ত্রে যাদেব বেশী অধিকার থাকে, তাবা সমাজে বেশী শক্তিশালী হ'য়ে পড়ে। গভর্নমেণ্ট তাদেব হাতে চলে যায় এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা নষ্ট হ'য়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ, জীবনে সকলের সমান সুযোগ দেওয়া দরকার। কারণ কোন শ্রেণীর লোক যদি অপব শ্রেণী থেকে বেশী সুযোগ পায়, তা হ'লে যাবা বেশী সুযোগ পেল, তাবা স্বভাবতই, যারা কম সুযোগ পেল, তাদের উপর বাজত্ব ক'বে। এই জন্ত সমাজে শ্রেণী থাকলে, ডেমোক্রাসী সফল হ'তে পারে না। তাবপবে ডেমোক্রাসী সমল ক'বে তুলবাব জন্ত সকলকে লেখাপড়া শেখবাব সমান সুযোগ দেওয়া দরকার এবং সকলের যাতে কিছু না কিছু কাজ থাকে এবং কাজ হাবিয়ে কেউ বেকাব না হ'য়ে পড়ে, তার ব্যবস্থাও কবা দরকার। শুধু কাজ দিলেই যথেষ্ট হয় না, বাজনীতিতে যোগ দেবার সুযোগ ও সামর্থ্য অর্জন কবাব জন্ত যথেষ্ট ছুটিও তাকে দেওয়া চাই। সোশ্যালিজম্ কি তা যদি বুঝে থাক, তা হ'লে দেখতে পাবে, সোশ্যালিজম্ এ-সবগুলোই মানুষের জীবনের পক্ষে সম্ভব ক'রে তোলে। কাজেই সোশ্যালিজমের মধ্য দিয়েই ডেমোক্রাসী সত্যিকার ডেমো-ক্রাসীতে পরিণত হ'তে পাবে। তা না হ'লে শুধু মুখে ব'লে দিলাম, সব মানুষ সমান, কিন্তু কাজের বেলা যে ছোট, তাকে ছোট ক'বেই যদি রাখি, তা হ'লে ডেমোক্রাসী হয় না, ঠিক তার উল্টো কবা হয়। এ-বকম অবস্থায় জনসাধারণের হাজার সুযোগ-সুবিধা আইনে লেখা থাকলেও সেগুলো কখনও কাজে লাগান যায় না।

উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার থাকিলেই সমাজে

শ্রেণী থাকবে এবং সমাজে শ্রেণী থাকলেই শ্রেণী-সংগ্রাম থাকবে। এই শ্রেণী-সংগ্রাম যখন খুব গুরুতর আকার ধারণ কবে, এবং যখন শ্রমিক-শ্রেণী গভর্ণমেন্ট হস্তগত করার উপক্রম করে, তখন বুর্জোয়া-শ্রেণীর পক্ষে আব ডেমোক্রাসীর মুখোস বাখা সম্ভব হয় না। তখন তারা ডেমোক্রাসীব মুখোস ফেলে দিয়ে খোলাখুলি ভাবে শ্রমিকদের নিপেষণ আবস্ত করে, অর্থাৎ ফ্যাসিজম্ চালু কবে। এই জন্য শ্রেণী-বিভক্ত বুর্জোয়া ডেমোক্রাসী কখনও বেশীদিন স্থায়ী হ'তে পাবে না। শ্রেণী-সংগ্রামের ধাক্কায এব পতন অনিবার্য। শ্রেণী-হীন-সমাজেই শুধু ডেমোক্রাসী পূর্ণ ও সফল হ'তে পাবে।

শেষ কথা :

ইম্পেবিয়ালিজম্ যে ক্যাপিটালিজমের মধ্য থেকেই বেবিযে-আসা অনিবার্য ফল, এ-বোধ হয় তোমরা এখন বুঝতে পাবছ। ইম্পেবিয়ালিজম্ ও ফ্যাসিজম্ দু'টো আলাদা জিনিস নয়, ক্যাপিটালিজমের দু'বকম রূপ। ক্যাপিটালিজম্ যে সব সমস্তার সৃষ্টি কবে, বুর্জোয়া-শ্রেণী সেই সব সমস্তার সমাধান ক'ববার জন্য ইম্পেবিয়ালিজম্ ও ফ্যাসিজমের আশ্রয় নেয়। কিন্তু আমরা দেখেছি, ইম্পেবিয়ালিজম্ ও ফ্যাসিজম্ কিছুদিনের জন্য মাত্র এই সব সমস্তাগুলো ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পাবে, সম্পূর্ণ সমাধান ক'বতে পাবে না। এর সমাধান হয় সোশ্যালিজমের

ভেতৰ দিযে। সোশ্চালিজমই হ'ল ক্যাপিটালিজমেৰ শেষ ফল। এই ফলেৰ জন্ম দিযে ক্যাপিটালিজম্ ম'ৰে যায়। কিন্তু সোশ্চালিজমেৰ জন্ম নিতে অনেক সংঘৰ্ষেৰ দৰকাৰ হয়, অনেক বক্তৃপাতও হয় এবং যদি জনসাধাৰণ সোশ্চালিজমেৰ আবশ্যকতা সন্মুখে সচেতন না হয়, তৰে সময়ও অনেকদিন লাগে। এই সব বক্তৃপাত ও সংঘৰ্ষ অনেক কম ক'বে দেওযা যায়, যদি লোকে সোশ্চালিজম্ যে দৰকাৰ এবং একদিন তা আসবেই, এটা বেশ ভাল ক'বে বোঝে এবং সোশ্চালিজম্ যাতে শীঘ্ৰ আসতে পাবে, তাৰ জন্ত চেষ্টা কৰে। যত বেশী লোক এটা ভাল ক'বে বুঝবে এবং এৰ জন্ত চেষ্টা ক'ববে, ততই মানুষেৰ এই অনাবশ্যক দুঃখভোগ কমে যাবে।

[সাত]

পৃথিবীৰ ৰাজনীতি

গত মহাযুদ্ধেৰ সময় ১৯১৭ সালেৰ নভেম্বৰ মাসে বলশেভিক দলেৰ নেতৃত্বে ৰুশ-দেশে বিপ্লব হয় এবং ধনি-শ্ৰেণীৰ হাত থেকে গভৰ্ণমেণ্ট শ্ৰমিক ও দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণেৰ হাতে চলে যায়। ৰুশ-দেশে শ্ৰমিকদেৰ হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ায় সমস্ত পৃথিবীৰ পুঁজিবাদীবা অত্যন্ত ভীত হ'য়ে পড়ে। কাৰণ ৰুশ-দেশেৰ শ্ৰমিকদেৰ দেখাদেখি তাদেৰ

দেশের শ্রমিকবাও যদি উৎসাহিত হ'য়ে বিপ্লব ঘটিয়ে বসে সেই ভয়ে তাবা ধনীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে ওঠাব জন্ত রুশ-দেশের শ্রমিকদের বেশ কিছু শিক্ষা দিয়ে অঙ্কুবেই বিনাশ করার সংকল্প গ্রহণ কবে। ইংবেজ, ফবাসী, জার্মানী, জাপান, আমেরিকা, পোলাণ্ড, কমেনিয়া প্রভৃতি সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিই রুশ-দেশে সৈন্ত পাঠিয়ে দেয শ্রমিক-শ্রেণীকে ধ্বংস ক'বে দিতে। কিন্তু লাল-ফৌজের বিক্রমেব কাছে এবা কেউ টিকতে পাবে না। তা ছাড়া এই সব দেশগুলোতে শ্রমিকবা দাবী ক'বতে থাকে যে রুশ-দেশ থেকে সৈন্ত—সামন্ত সব ফিবিযে আনা হোক। এই ছুই কাবণে পুঁজিবাদীবা তখনকাব মত রুশ-দেশ থেকে “পবে দেখে নেব” বলে পবম-বিক্রমে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ ক'বে “ছোট লোকেব” দেশ রুশিয়াকে ঠাণ্ডা ক'বতে না পাবলেও পুঁজিবাদীরা তখন অর্থনৈতিক বযকোট ক'বে তাকে জঙ্গ ক'ববাব চেষ্টা ক'বতে থাকে। রুশিযাব মালপত্র কেনা বা বিক্রী কবা, টাকা ধাব দেওয়া ইত্যাদি সব বন্ধ ক'বে রুশিয়াকে “ভদ্র” পুঁজিবাদী সমাজ থেকে এক ঘবে ক'বে বাখে। এব ফলে রুশিয়াকে বষ্ট পেতে হয় খুব। তিন বছর যুদ্ধ, তাব উপর দু'বছর গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি কাবণে দেশের উৎপাদন খুব কমে যায় এবং দেশে দুর্ভিক্ষ হ'য়ে অনেক লোক মারা যায়। পুঁজিবাদিবা ভেবেছিল এবাব সোভিয়েট দেশ সাবাড হ'ল। কিন্তু দুর্ভিক্ষকেও ক্রমশঃ

সোভিয়েট দেশ দূব কবে দিল। এর পর সব বাধা বিপত্তি কাটিয়েও কশ-দেশ দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ ক'বতে থাকে।

এর পর থেকে পৃথিবীর বাজনীতিতে নূতন এক জিনিস জন্ম নিল। এতদিন পুঁজিবাদীদের নিজেদের ভেতর বেষাবেষি, সাম্রাজ্যলাভের ইচ্ছা, পুঁজিবাদী দেশের আক্রমণের ভয় ইত্যাদি ছিল। এখন তা ছাড়াও আর এক নূতন উপসর্গ এসে জোটে। তা হ'চ্ছে “বলশেভিক ভীতি”। অর্থাৎ বলশেভিক কৃষিাব সাফল্য দেখে, তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যদি পুঁজিবাদীদের নিজের দেশের শ্রমিক-শ্রেণী বলশেভিকদের মত বিপ্লব ক'বে বসে—এই ভয়। ইংবেজ, ফরাসী প্রভৃতি সাম্রাজ্যওয়ালা দেশগুলোর বাজনৈতিক চালবাজীর মোটামুটি উদ্দেশ্য হ'ল সাম্রাজ্যহীন দেশগুলোর আক্রমণ থেকে নিজেদের সাম্রাজ্য বক্ষা করা এবং শ্রমিক-বিপ্লব যাতে নিজেদের দেশে এবং অগ্ন্যাগ্ন দেশে না ছড়িয়ে পড়ে তাই চেষ্টা করা। জার্মানী, ইটালী, জাপান প্রভৃতি সাম্রাজ্যহীন দেশগুলির উদ্দেশ্য হ'ল—নিজেদের দেশ থেকে এবং অগ্ন্যাগ্ন দেশ থেকে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে দূব করা এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার করা। সাম্রাজ্যের বিস্তার করা নিয়ে কলোনীহীন ও কলোনীওয়ালা পুঁজিবাদী দেশগুলোর ভেতর বেষাবেষি চলতে লাগল খুব, কিন্তু বিপ্লবের ধ্বংস-সাধন করা সম্বন্ধে এরা ছিল সব একমত। এই বিপ্লবের বীজ

কৃষিয়া থেকেই ছড়াচ্ছিল বলে কৃষিয়া সমস্ত পুঁজিবাদীদের শত্রু হয়ে পড়ল।

বিপ্লবের ঠিক পবে পুঁজিবাদী দেশগুলোর বিনা কাবণে আক্রমণ সমাজতন্ত্রী কৃষিয়া ভোলে নি এবং তাবা ভাল ক'বে জানত যে সুযোগ পেলেই পুঁজিবাদী দেশগুলো আবার কৃষিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়বে। কৃষিয়ার নেতাবা বাবে বাবে জনগণকে এ বিষয়ে সাবধান কবে দিযেছিল এবং অন্তঃশস্ত্র তৈরী ক'বে ও শিক্ষা দিযে লালকোঁজকে যতদূব সম্ভব শক্তিশালী ক'বে তোলাব চেষ্টা কচ্ছিল। অশ্রান্ত দেশ সম্বন্ধে কৃষিয়ার নীতি ছিল মোটামুটিভাবে এইরূপ— আত্মবক্ষা কবা ও অশ্রান্ত দেশে যাতে বিপ্লব হয় তাব চেষ্টা করা। এই দুই উদ্দেশ্যই সফল হ'ত যদি যুদ্ধ বন্ধ কবা যেত। কাবণ যুদ্ধ হ'তে না দিলে, কৃষ দেশেব উপব আক্রমণ হ'তই না। আব যুদ্ধ ক'রে কলোনী আদায় ক'বতে না পাবলে পুঁজিবাদী দেশে অর্থসঙ্কট ইত্যাদি দূব কবা যায় না এবং অর্থসঙ্কট দূব ক'বতে না পাবলে পুঁজিবাদী দেশে বিপ্লব না হ'য়ে পাবে না।

পুঁজিবাদীবাও যুদ্ধ না থাকাতে নিজেবাই খুব ব্যবসা-সঙ্কটের মধ্যে হাবুডাবু খাচ্ছিল। সেই সময়ে দেখা গেল—সোভিয়েট ব্যবস্থায় কৃষ দেশেব খুব উন্নতি হচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশে অবস্থাব অবনতিব সঙ্গে সোভিয়েটেব সাফল্য ও জনগণের অবস্থার দ্রুত উন্নতি তুলনা ক'বে সকল দেশেবই

জনগণ ক্রমেই সোভিয়েট-পন্থী হ'য়ে উঠছিল। কাজেই যুদ্ধ বন্ধ ক'বে শান্তি বজায় রাখা গেলে সোভিয়েটের আত্মবক্ষাও হ'ত আবার অন্ত্যান্ত দেশে বিপ্লবও এগিয়ে আসত। কাজেই এই সময়ে যাতে যুদ্ধ বন্ধ হয় তাব জন্ত সোভিয়েট প্রাণপণ চেষ্টা ক'বতে থাকে। বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলোও যুদ্ধ না হওয়াব পক্ষে ছিল। কাবণ যুদ্ধ হ'লে সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাম্রাজ্য হাবাবাব সম্ভাবনা, আব দুর্বল পুঁজিবাদী দেশের ভয়—যুদ্ধ হ'লে তারা স্বাধীনতাই হাবাবে। কাজেই পুঁজিবাদী দেশের মধ্যেও এবা কতকটা যুদ্ধে বিবোধী ছিল। স্মৃতবাং সোভিয়েট চেষ্টা ক'বতে লাগল যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে সব দেশ, সে গুলোকে একত্র ববে একদলে টেনে নিয়ে আসতে এবং তাদের সম্মিলিত শক্তিব ভয় দেখিয়ে যাবা যুদ্ধ ক'বতে চায় তাদের যুদ্ধের থেকে দূবে বাখতে। এই নীতিব নাম ছিল “যুক্ত-নিবাপত্তা” (collective security), অর্থাৎ সকলে মিলে নিবাপদ থাকাব চেষ্টা কবা। লিটভিনফ এই নীতি কাজে লাগাবাব জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা ক'বতে থাকেন। জাতিসংঘে তিনি বাবে বাবে যে দেশ যুদ্ধ ক'বতে চাইবে সে দেশের বিরুদ্ধে অন্ত সমস্ত জাতির সংজ্ঞবদ্ধ শক্তি নিয়োগ ক'ববাব প্রস্তাব আনেন। কিন্তু প্রধানতঃ ইংবেজদের বিবোধিতাব জন্তই এই নীতি সফল হয় না। জাৰ্মানী, ইটালী এবং জাপানও এই নীতিতে সাব দিতে চায় না।

জার্মানী, ইটালী এবং জাপানের যুদ্ধ ক’বতে চাওয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে কষ্ট হয় না। তাদের অনেকের কলোনী বিশেষ নেই অন্ততঃ তেমন বড় কলোনী নেই। কলোনী না থাকায়, তাদের কলোনী আদায় কবা দবকাব এবং কলোনী আদায় ক’বতে গেলে যুদ্ধেব দবকার। কাজেই শান্তিব প্রস্তাবে এবা কোনমতেই সায দিতে চায় নি। কিন্তু এদের বিবোধিতা সত্ত্বেও যুদ্ধ বন্ধ কবা যেত, যদি ইংবেজেবা “যুদ্ধ-নিবাপত্তা” নীতি গ্রহণ ক’বত।

ইংবেজ সাম্রাজ্যবাদীবা এ নীতি গ্রহণ ক’বল না কেন ? তাব দু’টি কাবণ ছিল। সবচেয়ে বড় কাবণ হ’ল বিপ্লবের ভয়, কাবণ তাদের দেশে পুঁজিবাদের অবস্থা সঙ্গিন হচ্ছিল। জার্মানীকে ইংবেজ বাজনীতিবিদবা ববাববই “বিপ্লবের বিৰুদ্ধে প্রাচীৰ” হিসেবে দেখে এসেছেন। ভাবতেন সোভিয়েট বিপ্লবের বিৰুদ্ধে তাবাই ইউবোপে পুঁজিবাদের প্রাচীৰ। লযেড জৰ্জ্জ খোলাখুলি ভাবে এ কথা স্বীকাৰ ক’বে গিয়েছেন। জার্মানীতে যদি সোভিয়েট গবৰ্ণমেণ্ট স্থাপিত হয় তা হ’লে গোটা ইউবোপে বিপ্লবের ঢেউ ছড়িয়ে যাবে এবং সে ঢেউযেব ধাক্কা ইংলণ্ডও সামলাতে পাববে না। কাজেই জার্মানীতে বিপ্লব হ’তে দেওয়া মানে সমস্ত ইউবোপে এবং তাবপব গোটা পৃথিবীতে বিপ্লব হ’তে দেওয়া। সুতরাং জার্মানীতে, শুধু জার্মানী কেন পৃথিবীর যে কোন দেশে বিপ্লব হ’তে না দেওয়া ইংলণ্ডেব পবিত্র

দায়িত্ব হ'য়ে প'ড়ল। দ্বিতীয় কাৰণ হচ্ছে ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটেনের রেষাবেষি, ফ্রান্স যাতে ইংলণ্ডের সমান সমান না হ'য়ে ওঠে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকাৰ। কাৰণ ফ্রান্স ইংলণ্ডের সমান হ'লে হয়ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপদগ্রস্ত হ'য়ে পড়তে পাবে। কাজেই ফ্রান্সকেও খানিকটা চেপে রাখা দরকাৰ। এ কাজে জার্মানীকে মুণ্ডব হিসেবে ব্যবহাৰ কৰা ইংবেজের পক্ষে খুব সুবিধাজনক ছিল। কাৰণ ফ্রান্স ও জার্মানীৰ বহু পুৰাতন ঝগড়া পৰস্পৰের বিৰুদ্ধে পৰস্পৰকে ভীষণ সন্দিহান ক'ৰে তুলেছিল। গত মহাযুদ্ধের পৰ থেকে ফ্রান্স চেষ্টা ক'ৰতে থাকে জার্মানীকে একেবাবে পজু ক'ৰে রাখতে, আৰ উঠতে না দিতে। কিন্তু ইংবেজ দেখল জার্মানীকে যদি সেভাবে ধ্বংস হ'তে দেওয়া যায় তা হ'লে ফ্রান্সকে বোধ ক'ৰাব ইউৰোপে আৰ কেউ থাকে না। কাজেই জার্মানীকে একেবাবে ধ্বংস হ'তে দিলে চলবে না। মুণ্ডব যাতে বেশ পাকাপোক্ত এবং ব্যবহাৰযোগ্য থাকে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এব জন্ম যখন জার্মানীৰ কোন বিপদ দেখা গিয়েছে তখনই ইংবেজ পুঁজিবাদীৰা জার্মানীৰ সাহায্যের জন্ম ছুটে এসেছে। টাকা ধাৰ দিয়ে, ভাসাঁই সন্ধিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধের জাহাজ তৈরীৰ হুকুম দিয়ে জার্মানীকে সাহায্য কৰেছে।

যুক্ত-নিরাপত্তা নীতিতে সম্মত হওয়া মানে জার্মানীকে সাম্রাজ্য বিস্তাৰ ক'ৰতে না দেওয়া। ইংৰাজ পুঁজিবাদীরা

ভাল ক'রে জানত যে জার্মানীকে সাম্রাজ্য বিস্তার ক'বতে না দিলে, হিটলাবের পতন হবে এবং জার্মানীতে বিপ্লব আটকান যাবে না। জার্মানীতে বিপ্লব হ'লে যেমন সমস্ত ইউরোপে বিপ্লব হবার ভয়, তেমনি আবার যদি বিপ্লব নাও হয় তা হ'লে ফ্রান্স খুব বেশী পরিমাণে শক্তিশালী হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনা। কাজেই জার্মানীকে সাম্রাজ্য আদায় ক'বতে দিতেই হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যাতে হিটলাবের আক্রমণ থেকে বক্ষা পায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সুতরাং হিটলাব যাতে পূর্ব ইউরোপের দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার কবে, ইংবেজ পুঁজিবাদীরা তাব চেষ্টা ক'বতে লাগল। অর্থাৎ সোভিয়েট রুশিয়াকে যেন আক্রমণ কবে তাব জন্য হিটলাবকে পুষতে লাগল এবং উৎসাহিতও ক'বতে লাগল। হিটলাব রুশিয়াকে আক্রমণ ক'বে পবাস্ত ক'বতে পাবলে, এক টিলে ছ'পাখা মাঝা যাবে,— জার্মানীৰ সাম্রাজ্য বিস্তারও হবে এবং পুঁজিবাদীদের বুকের কাঁটা সোভিয়েটের ধ্বংসসাধন ক'বে বিপ্লবের ভয় দূৰ কবা যাবে। কাজেই ইংবেজরা প্রাণপণ চেষ্টা ক'বতে লাগল যাতে হিটলাব রুশিয়াকে আক্রমণ কবে। এই সকল কাবণে যুক্ত-নিবাপত্তা নীতি তাদের পক্ষে গ্রহণ কবা সম্ভব ছিল না।

যুক্ত-নিবাপত্তা নীতি গ্রহণ না ক'বে যে নীতি ইংলণ্ডের শাসকেবা গ্রহণ ক'বল, তাব নাম “শান্ত কবাব” নীতি বা appeasement policy চেষ্টাবলেন তখন ইংলণ্ডের প্রধান

মন্ত্রী। চেম্বারলেনের সাক্ষোপাঙ্গ যাবা এই “শান্ত কবাব” নীতি সমর্থন ক’বত তাদের বলা হয় “ক্লাইভডেন সেট”। লণ্ডনের অল্প দূরে ক্লাইভডেন নামক জায়গায় তাদের একজন সমর্থকের বাড়ী। এরা প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে সে বাড়িতে জড় হ’ত এবং সেখানে বসে তাদের যত বকম ষড়যন্ত্র সব ঠিক হ’ত। এরা সবাই ছিল বড় বড় ব্যাঙ্ক ও কলেব মালিক এবং প্রত্যেকেই হিটলাব এবং মুসোলিনীৰ ভক্ত। রুশিয়াকে এরা ভয়ঙ্কর ঘৃণা কবত এবং হিটলাবের মত এরাও পৃথিবী থেকে বলশেভিকবাদ ধ্বংস কবাব সদিচ্ছা পোষণ ক’বত। অর্থাৎ প্রকাশ্যে না হ’লেও মনে প্রাণে এরা ফ্যাসিবাদেবই ভক্ত ছিল। এদের এই “শান্ত কবাব নীতি”র অর্থ হ’ল এই যে যখনই কোন ফ্যাসিষ্ট দেশ অথবা কোন দুর্বল দেশকে আক্রমণ ক’বত তখন এরা গিয়ে ঐ দুর্বল দেশের কিছুটা ফ্যাসিষ্ট দেশকে ছেড়ে দিয়ে ফ্যাসিষ্টবা আর বেবশী দূব এগুবে না এইকপ একটা সন্ধি ক’বে শান্তি স্থাপন ক’বত এবং ফ্যাসিষ্টদের শান্ত ক’বে আসত। দুর্বল দেশ ভাবত অল্প কিছুতেই সে বক্ষা পেয়ে গেল। পৃথিবীৰ জনসাধারণ ভাবত এ যাত্রা যুদ্ধের হাত থেকে বক্ষা পাওয়া গেল। ইল্যাণ্ডের লোকেবা চেম্বারলেনকে শান্তির দূত বলে শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, বিগলিত হ’য়ে ধন্য ধন্য ক’বতে থাকত। ফ্যাসিষ্টবা শুধু মনে মনে হাসত। এই শান্ত ক’বাব নীতি প্রথম দেখা গেল ইটালীৰ আবিসিনিয়া আক্রমণ-কালে।

রুশিয়া প্রস্তাব ক'বল ইটালীকে সম্পূর্ণরূপে “বয়কট” ক'রে সুয়েজ-খাল বন্ধ ক'বে দিতে। সুয়েজ-খাল বন্ধ ক'বে দিলে আবিসিনিয়ায় সৈন্ত-সামন্ত পাঠান ইটালীও পক্ষে সম্ভব হ'ত না। বাধ্য হ'য়েই মুসোলিনীকে যুদ্ধ বন্ধ ক'বতে হ'ত। কিন্তু ইংবেজেবা আধাআধি “বয়কট” নীতি গ্রহণ ক'রল। তাব ফলে মুসোলিনীও বিশেষ কিছু অশুবিধা হ'ল না। বিষ-বাস্প ব্যবহার ক'বে মুসোলিনী আবিসিনিয়া দখল ক'বে নিল।

শান্ত ক'বার নীতি এর পবেই দেখা গেল স্পেনে। স্পেনে বিপ্লব হ'বার পব গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট স্থাপিত হয়। এই গভর্নমেন্টে অনেকখানি পরিমাণে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। কিন্তু এই গভর্নমেন্ট বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীকে ধ্বংস ক'বার নীতি গ্রহণ ক'বল না। এমন কি বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীও নেতারা সেনাপতিও পদ দখল ক'রে থাকল। এর ফলে কিছুদিনের ভেতরই বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণী ষড়যন্ত্র ক'রে জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রান্সিসকো বিদ্রোহ আবিস্ত ক'রল। হিটলাও ও মুসোলিনী হাজার হাজার সৈন্ত, অস্ত্রশস্ত্র, এবোপ্লেন ও ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে জেনারেল ফ্রান্সিসকো সাহায্য ক'বতে লাগল। স্পেনের গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাল। ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকা ইত্যাদি গণতান্ত্রিক দেশের গভর্নমেন্ট বলতে লাগল, স্পেনের গোলমাল

তাদের নিজেদের ভেতর ঝগড়া। অন্য দেশের নিজেদের ভেতরের ঝগড়ায় আমবা হস্তক্ষেপ ক'বতে বাজী নই। হিটলাব, মুসোলিনী যে হাজার হাজার সৈন্য পাঠিয়ে স্পেনের যুদ্ধকে আর ঘবোয়া ব্যাপাব ক'বে বাখে নি, সে কথা তাবা শুনতেই চাইল না। তাদের আসল উদ্দেশ্য—স্পেনে যাতে বিপ্লব ধ্বংস হ'য়ে গিয়ে আবার বুর্জোয়াদের শাসন স্থাপিত হয়। এবং বিপ্লব ধ্বংস করার কাজ এবাবও এবা হিটলার ও মুসোলিনীর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হ'য়ে থাকল।

অবশ্য আভিসিনিয়াবও আগে এই নতুন ব্যাধি এশিয়ায় দেখা দিয়েছিল। জাপানী ফ্যাসিবাদ চীনদেশের মাফুবিয়া দেশটা দখল কবেছিল—কেউ বাধা দিলে না। তখন জাপানীবা চীন আক্রমণ ক'বে একটু একটু ক'বে এগিয়ে যেতে লাগল। জায়গায় জায়গায় ইংবেজদেবও জাপান সুবিধে মত ছ' এক ঘা ঠুকে দিচ্ছিল। কিন্তু তবুও চেম্বাবলেন তার “শান্ত করার নীতি” চালিয়ে যেতে লাগল। জাপানকে তোয়াজ ক'রে খুশী করার চেষ্টা ক'রতে লাগল।

ভাবল—জাপানের ক্ষুধাটা চীনের উপর দিয়ে মিটলে ক্ষতি কি? ব্রিটেনের সাম্রাজ্য তো বইলই, তারপরে চীনেবাও যেমন বড় জাত, চাপা থাকলে ভালোই।

হিটলাব এদিকে তার সাম্রাজ্য-স্থাপন করার কাজে উঠে পড়ে লেগে গেল। অস্ত্রীয়া বিনা যুদ্ধেই হাত ক'রে নিল। তারপর চেকোস্লোভাকিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ

সুডেটানল্যাণ্ডেব উপৰ হাত দিল। চেম্বাবলেন তখন বিমানে উড়ে গিবে মিউনিক সহবে হিটলাবেব সঙ্গে দেখা ক'বে চেকোশ্লোভাকিয়া ও জাৰ্মানীৰ ভেতৰ এক সন্ধি ক'ৰে আসে। এই সন্ধিৰ ফলে সুডেটেনল্যাণ্ড জাৰ্মানীৰ হ'যে যায়। বাকী চেকদেশও প্ৰায় হিটলাবেব তাঁবেদাৰ হ'যে যেতে বাধ্য হয় এবং জাৰ্মানী আব অগ্ৰসৰ হবে না বলে প্ৰতিশ্ৰুতি দেয়। কিন্তু ক'মাস যেতে না যেতেই তাবপবেব প্ৰদেশ ছ'টো হিটলাব দখল ক'বে নিল।

চেম্বাবলেন যখন দেখল হিটলাব তাব কথামত চলছে না তখন হিটলাবকে একটু ছমকি দেবাব জন্তু কশিয়াব সঙ্গে পবম্পাব যুদ্ধেব সময় সাহায্য ক'ববাব চুক্তি ক'বাব ভাণ ক'বল। কশদেশেব সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাবাব জন্তু কয়েক জন ব্ৰিটিশ কৰ্মচাৰীকে মস্কোতে পাঠিয়ে দিল, কিন্তু এবা সবাই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী ছিল এবং চুক্তি স্বাক্ষৰ কবাব মত কোন ক্ষমতা এদেব ছিল না।

এই ভয় দেখাবাব সঙ্গে সঙ্গে আবাব হিটলারকে টাকা ধাব দিয়ে বশ ক'ববাব চেষ্টাও চলতে লাগল। বোর্ড অব ট্ৰেড নামে ইংলেণ্ডেব প্ৰধান আধা-সৰকাৰী ব্যবসায়ীদেব সহ সভাপতি জাৰ্মানীকে কয়েক লক্ষ পাউণ্ড ধাব দিতে চাইল।

এই সব কথা সোভিয়েট দেশ টেব পাছিল। আগেব অভিজ্ঞতা থেকে বিচাব ক'বেও ষ্টালিন চেম্বাবলেনেব এ চাল অনায়াসেই ধৰে ফেলতে পাবল। হিটলারও এই সময়

পরস্পরকে আক্রমণ করবে না বলে এক চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে মস্কোতে লোক পাঠাল। হিটলার ববাবরই ভয় ক'রছিল যে পূর্ব ও পশ্চিম দুই বণক্ষেত্রেই যদি যুদ্ধ ক'বতে হয় তা হ'লে তাব জয়ের আশা কম। সুতরাং হিটলার চেষ্টা ক'বছিল যাতে শুধু মাত্র একটি বণক্ষেত্রে তাকে যুদ্ধ ক'বতে হয়। হয় ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে পশ্চিম-বণক্ষেত্রে না হয় পূর্ব বণক্ষেত্রে রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবে। রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ না করার চাবটি কাবণ হিটলার লর্ড লণ্ডনডেরীকে বলেছিল। এক, রুশিয়ার সৈন্ত-সামন্ত ও অস্ত্র-শস্ত্র। দুই, রুশিয়ার বিশাল বিস্তৃতি। তিন, রুশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং চাব, রুশিয়ার লোকদেব আদর্শ নির্ভা। এই চার কাবণে হিটলার সেই সময়ে রুশ দেশ আক্রমণ ক'বতে সাহস ক'বল না। রুশিয়ার তুলনায় পশ্চিম বণক্ষেত্রে জয়লাভ কবা অনেক সহজ। তাই হিটলার ২০ বছরের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করবে না বলে রুশিয়ার সঙ্গে এক চুক্তি ক'রল। এব ফলে সোভিয়েট রুশিয়ারও খুব সুবিধা হ'ল। কারণ হিটলারকে সোভিয়েট দেশের সঙ্গে চুক্তি ক'রতে দেখে চেম্বারলেন প্রভৃতি পুঁজিবাদীরা ক্ষেপে গেল। পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যেই যুদ্ধ বেধে গেল— হিটলার আক্রমণ ক'বল পোল্যান্ড। নিজেদের ভেতর তারা ঝগড়া করেই শক্তিক্রয় ক'রতে লাগল, রুশিয়াও তখন নিজের শক্তি বাড়াবার সময় ও সুযোগ পেল।

১৯৩৯ অব ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ ক'রল এবং কয়েকদিনের চেষ্টায় পোল্যাণ্ড বিধ্বস্ত ক'রে ফেলল। রুশিয়া ঠিক করে—তাব সীমান্ত এখনি শক্তিশালী করা দবকার। সেই নীতি অনুযায়ী সে পোলাণ্ডের সবটা জার্মানীর হাতে যেতে দিল না। লালফৌজ অগ্রসব হ'য়ে গেল। গত মহাযুদ্ধের পবে যে প্রদেশটি পোল্যাণ্ড রুশিয়ার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল এবাব তা লালফৌজ দখল ক'বল--জার্মানীর হাতে পড়তে দিল না, ততদূব অবধি লালফৌজ অগ্রসব হ'য়ে থাকল। এব পবে মোভিয়েটেব “পশ্চিম সীমান্ত শক্তিশালী করার নীতি” অনুযায়ী ফিনল্যাণ্ডের কাছে মোভিয়েট লেনিনগ্রাড সহর নিবাপদ করার জন্তু খানিকটা জায়গা দাবী ক'বল। বরাবরই ফিনল্যাণ্ডে তখন পুঁজিবাদীদের ষড়যন্ত্র চলছিল। ব্রিটিশ ও ফরাসী বুর্জোয়াদের প্ররোচনায় এ সময়ে ফিনল্যাণ্ড এই জায়গা দিতে অস্বীকার ক'রল। লালফৌজ তখন যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে এই জায়গা দখল ক'বে নিল। আশ্চর্য্য এই যে, ইংরেজ ও ফরাসী গভর্নমেন্ট চেকোশ্লোভাকিয়া হিটলার দ্বারা আক্রান্ত হ'লে হিটলারের বিরুদ্ধে কোন সৈন্ত পাঠাবার কল্পনাই করে নি ববং ছুটে হিটলারকে শাস্ত ক'রতে গেছে। সেই ইংরাজ ও ফরাসী পুঁজিবাদী ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় উৎসাহী হ'য়ে উঠল। রুশদেশের বিরুদ্ধে সৈন্ত পাঠাবার সব বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল। কিন্তু

সুইডেন এই সৈন্য তার সীমানার ভেতর দিয়ে পার হ'তে না দেওয়ায় সৈন্য পাঠান আর হ'ল না। রুশিয়া ফিনল্যান্ডকে পরাস্ত ক'রে ফেললেও লেনিনগ্রাদের কাছাকাছি যে জায়গাটুকু ফিনল্যান্ডের কাছ থেকে নিল তার বদলে তার চাইতে বেশী জায়গা ফেরৎ দিল উত্তর দিকে, এবং যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ কিছুই আদায় ক'বল না। ফিনল্যান্ডের পুঁজিবাদীদেরও কোন শাস্তি দিল না। এর পর লালফৌজ পশ্চিম সীমান্তের লার্টভিয়া, লিথুনিয়া ও এসথোনিয়া নামক ছোট তিনটি দেশকে সুরক্ষিত ক'রে স্বপক্ষে আনতে চেষ্টা ক'বল ঐ একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পশ্চিম-সীমান্তে যাতে বুর্জোয়ারা আক্রমণ ক'রে সহজে বিশেষ সুবিধা না ক'রতে পারে। ওসব দেশও তখন হিটলারের ভয়ে কাঁপছে। তারা নিজেদের পালিয়ামেন্টে প্রস্তাব গ্রহণ ক'রল—তারা সোভিয়েট-মণ্ডলে যোগ দেবে। ইংরেজ ও ফরাসী পুঁজিবাদী কাগজগুলোয় তখন সমাজতন্ত্রী রুশিয়া সাম্রাজ্যবাদী হ'য়ে গেছে বলে ভীষণ চীৎকার আবিস্ত করেছিল। বস্তুতঃ জার্মানী তাদের কথামত রুশদেশ আক্রমণ না ক'রে তার সঙ্গে মিতালি করায় তারা রুশদেশের ওপর ভয়ঙ্কর ক্ষেপে গিয়েছিল। এখন—যখন দেখা গেল হিটলার সোভিয়েট দেশ সবলে আক্রমণ ক'রছে—তখন সবাই স্বীকার ক'রছে যে রুশিয়া এই সব দেশ আগেই হাত ক'রে খুব বুদ্ধিমানের কাজই ক'রেছিল। কারণ তা না হ'লে জার্মানীর আক্রমণ

থেকে রুশ-দেশ রক্ষা ক'বা যেত না এবং আজ হয়ত গোটা পৃথিবীতে ফ্যাসিবাদের প্রভুত্ব কায়েম হ'য়ে যেত।

কশ ও জার্মানীর চুক্তির পবই চেশ্বারলেন দেখল যে তার “শান্ত-করার” নীতি অকেজো হ'য়ে পড়েছে এবং ষ্টালিনের কাছে বাজনৈতিক চালবাজীতে সে পরাজিত হ'য়েছে। জার্মানী এদিকে দিন দিন একটার পর একটা দেশ দখল ক'বে শক্তিশালী হ'য়ে উঠছে এবং শক্তিশালী হ'য়ে সে ব্রিটিশসাম্রাজ্যই আক্রমণ ক'ববে। কাজেই হিটলারকে আব সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না। জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ ক'রলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তাই জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রল ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। যে হিটলারকে ইংরেজরা সময়ে পুষেছিল সেই এবাব ইংবেজদের আচ্ছা ক'রে দংশন ক'বে দিল। হিটলার যুদ্ধেব প্রয়োজনে নরওয়ে ও ডেনমার্ক দখল ক'বে নিল এবং ইংল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে ফ্রান্স আক্রমণ ক'রল। কিন্তু প্রত্যেক দেশেই বূর্জোয়াদের মধ্যে হিটলারের বন্ধু ছিল অনেকে। ফরাসী দেশের বূর্জোয়াদের ভেতরও অনেকে হিটলারের পক্ষে ছিল, তারা স্বাধীনতার থেকে বেশী ভয় ক'রত তাদের দেশের শ্রমিক বিপ্লবকে। তাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ২৯ দিনের মধ্যে ফরাসী দেশের পতন হ'ল। এরপর হিটলার ইংল্যাণ্ড আক্রমণের চেষ্টা ক'রতে

লাগল। ইংল্যাণ্ডে খুব বোমাবর্ষণ হ'তে লাগল। কিন্তু শুধু বোমাবর্ষণ ক'রে একটা দেশ দখল করা যায় না। হিটলার ইংল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠাবার চেষ্টা ক'রতে লাগল। ইংরেজদের মতে ব্রিটিশ নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর বিরুদ্ধে ফলে হিটলারের সৈন্য-সামন্ত ইংলিশ-চ্যানেল পার হ'তে পারে নি। সে যাই হোক, হিটলার ইংল্যাণ্ড আক্রমণ বন্ধ রেখে পূর্ব ইউরোপের দিকে দৃষ্টি দিল এবং এক এক ক'রে যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস দখল ক'রে নিল। ইউবোপের বাকী রাজ্যগুলো স্বেচ্ছায় হিটলারের পক্ষে যোগ দিল। সব দেশেই পুঁজিবাদীরা তো এই চায়—কাজেই শ্রমিক ও জনশক্তি মাথা তুলতে পারে নি। এভাবে গোটা ইউবোপে মাত্র দুটো শক্তি মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াল। ফ্যাসিষ্ট জার্মানী, ইটালী ও তাদের তাঁবেদাররা এবং সোস্যালিষ্ট রুশিয়া আব প্রত্যেক দেশের অত্যাচারিত শ্রমিক ও কৃষকের দল। জার্মানী সমস্ত ইউবোপের মালিক হ'য়ে যথেষ্ট শক্তিশালী হ'য়ে পড়েছিল এবং ইউবোপের প্রত্যেক দেশের বুর্জোয়াদের একটা অংশ হিটলারের পক্ষে এসে যোগ দিয়েছিল। এর ফলে মালপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যের অভাব হিটলারের থাকল না।

ফ্রান্সের পতনের পব থেকেই রুশ বুঝতে পারছিল যে যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এক একটা দেশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

সেই দেশের জনগণের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে পরিণত হচ্ছিল। বুঝা যাচ্ছিল—ফ্যাসিজমের পতন না হ'লে সে সব দেশের জনগণের স্বাধীনতা লাভ হবে না। অধিকৃত দেশগুলোর বুর্জোয়ারা হিটলারের সঙ্গে যোগ দেওয়ায়, এ ভাবে হিটলারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশের বুর্জোয়াদেব পতন ও সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের প্রশ্নও জড়িত হ'য়ে পড়ল। হিটলারের পতনের ভেতর দিয়েই সেই দেশগুলোতে সোশ্যালিস্ট বিপ্লব হ'বার সম্ভাবনা দেখা গেল। হিটলারের অতিরিক্ত শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় এবং হিটলারের পতনের ভেতর দিয়ে গোটা ইউরোপে সোশ্যালিস্ট বিপ্লব আসবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায়, সোভিয়েট রুশিয়া বুঝতে পারছিল যে হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য। হিটলারও রুশিয়ার মত শক্তিশালী দেশ পেছনে বেখে যুদ্ধ ক'রতে সাহস ক'রছিল না। যদিও উভয়েই ভেতর অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছিল, তা হ'লেও কেউ কাউকেই বিশ্বাস ক'রতে পারছিল না। উভয়েই জানত আজ হোক কাল হোক সোশ্যালিস্ট রুশিয়ার সঙ্গে ফ্যাসিষ্ট দেশগুলোর যুদ্ধ অনিবার্য। কাজেই শান্তির সুযোগ পেয়ে রাশিয়া পূর্ণবেগে নিজেকে শক্তিশালী ক'রছিল, জার্মানী সমস্ত ইউরোপের মালিক হ'য়ে খুব শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছিল। জার্মানী বুঝতে পারল যে রুশিয়াকে আর বাডতে দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ আর বাডতে দিলে রুশিয়ার সঙ্গে

শেষে আর পাবা যাবে না। ঠংবেজেব সঙ্গে যুদ্ধ ক'বে জার্মানী যদি জয়লাভও ক'বে তা হ'লেও রুশিয়ার হাত থেকে সে কিছুতেই বাঁচতে পাববে না। কাজেই রুশিয়াকে কাবু কবা অবিলম্বে দবকার। আর এখন রুশিয়াকে কাবু ক'বতে গিয়ে সমস্ত ইউবোপের বুর্জোয়া শ্রেণীব সাহায্য পাওয়া যাবে। এমন কি ইংল্যান্ডেব সঙ্গে একটা বোঝা-পড়াও হ'য়ে যেতে পারে। এই আশায় ও ভয়ে হিটলার হঠাৎ ১৯৪১ সালের ২২ শে জুন রুশিয়াকে অতর্কিতে আক্রমণ ক'বল। হিটলার নিজের স্বীকার ক'রে গেছে যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সে জীবনে কখনও গ্রহণ কবেনি। লালফৌজ পরম বিক্রমে সমস্ত ইউবোপেব সম্মিলিত শক্তিকে বাধা দিতে লাগল। প্রথম প্রথম লালফৌজকে অনেকদূর পেছনে হটে যেতে হয়েছিল। তাদের বর্ণনীতিতে এইটাই ছিল তখন উদ্দেশ্য—হিটলারকে বাধা দিয়ে দিয়ে সরে যাবে, তারপর হিটলাবের সৈন্যদেব দম ফুবিযে এলে লালফৌজ ক'রবে আক্রমণ। তাই এখন লালফৌজ ফ্যাসিষ্ট বাহিনীগুলোকে দেশ থেকে বিতাড়িত ক'রেছে। লালফৌজ এই যুদ্ধে যে সাহস, আত্মত্যাগ ও সোশ্যালিষ্ট-দেশের প্রতি ভালবাসা দেখিয়েছে তাতে আনেক সোভিয়েট-বিরোধীও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ বলতে বাধ্য হ'য়েছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এর আগেই ইংরেজের পক্ষে এক রকম যুদ্ধে যোগ দেয়। জার্মানীর সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকায়

ও জাপানের সঙ্গে চীনদেশের বাজারে তার প্রতিযোগিতা ক'বতে হ'ত খুবই। জাপান ও জার্মানীতে আবার বন্ধুত্ব— দু'জনাই সাম্রাজ্য চায বাড়াতে। এদেব কাবু ক'রতে পারলে এই সব বাজারে আমেরিকা একচ্ছত্র অধিকার পাবে, এই আশায় আমেরিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে পবোক্ষে ব্রিটেনকে সাহায্য ক'বত। জাপান যুদ্ধ আবস্ত ক'বলে -জার্মানী আমেরিকাব বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা ক'বল।

জাপান সুরোগ বুঝে প্রশান্ত মহাসাগবের ব্রিটিশ ও আমেরিকাব কলোনীগুলো অধিকার ক'বে নিল। এব ফলে জাপানীৰ সঙ্গে ইংবেজ ও আমেবিকাব যুদ্ধ বেধে গেল। ইংল্যাণ্ড ও আমেবিকা প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধেব জয় মোটেই তৈবী ছিল না। কাজেই অতি অল্প চেষ্টায়ই জাপান ইংল্যাণ্ড ও আমেবিকাকে হাবিয়ে দিয়ে ব্রহ্মদেশ অবধি এগিয়ে এল। এইরূপে যুদ্ধ ভারতের দুযাবে এসে হাজির হ'ল।

এই বিপদের সম্মুখীন হ'য়ে রুশিয়া, আমেবিকা, চীন ও ইংল্যাণ্ড পবস্পব পরস্পরকে সাহায্য ক'বতে বাজী হ'ল। এদের বলা হয় “মিত্র পক্ষ” বা “সম্মিলিত শক্তি”। জার্মানী, ইটালী ও জাপান বলশেভিজম্ ধ্বংস কবার জয় এক সঙ্গে বহুদিন আগেই যোগ দিয়েছিল। এদের বলা হয় “এক্সিস”-পক্ষ বা বাংলায় “অক্ষ-শক্তি” বা “চক্রশক্তি”।

ভারতের লোকদের এক্সিস-পক্ষে থাকা উচিত, না মিত্র-পক্ষে থাকা উচিত, না নিরপেক্ষ থাকা উচিত, এ নিয়ে আজও

আলোচনার শেষ হয়নি। এমন অনেকে আছেন যারা মনে করেন যে, এক্সিস-পক্ষ যুদ্ধে জিতলেই ভাল হয়। কারণ তা হ'লে ভারতবর্ষ থেকে জাপান ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবে এবং জাপান ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে যাবে। এ রকম লোকেব সংখ্যা অবশ্য খুব কম। তোমরা পুঁজিবাদী যে নিয়মের ফলে সাম্রাজ্যবাদী হ'তে বাধ্য হয় তা যদি বুঝে থাক, তা হ'লে সহজেই বুঝতে পাববে এ রকম মত পোষণ করা কত ভুল। কারণ পুঁজিবাদী দেশ অল্প দেশ দখল ক'রতে বাধ্য হয় বাজার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। মুখে সে মুসোলিনী'র মত বলে—‘আবিসিনিয়াকে সভ্য ক'রব’, বা ইংবেজদের মত বলে—‘ভারতবর্ষকে স্বাধীন ক'রব’ ইত্যাদি। যাই সে বলুক না কেন, জাপান যদি ভারতবর্ষ অধিকার করে তবে ভারতবর্ষকে “বাজাব” ক'রেই রাখবে— স্বাধীনতা দিয়ে রিটার্ন টিকিট ক'বে দেশে ফিবে যাবে না।

তা ছাড়া মিত্র-পক্ষ হেরে যাওয়া'র অর্থ কি? অর্থ শুধু যে ইংবেজ ও আমেরিকা হেরে যাওয়া তা নয়। মিত্র-পক্ষ হেরে যাওয়ার অর্থ চীন হেবে যাওয়া, রুশিয়া হেরে যাওয়া, অর্থ সমস্ত ইউরোপের লোকদের স্বাধীনতা হাবান এবং একদিকে তুর্কী, আবব, পারস্য, আফগানিস্থান হিটলারের অধীনে চলে যাওয়া এবং অল্পদিকে চীন, ইন্দোচীন, শাম, ব্রহ্মদেশ, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি জাপানের অধীনে চলে যাওয়া। এইরূপে গোটা ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া

যখন ফ্যাসিষ্টদের করায়ত্ত তখন ভারতবর্ষ যে একা একা
নিজের শক্তির জোরে স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে তা
অসম্ভব। আমরা তখন স্বাধীন থাকলে জার্মানী বা
জাপানীদের দয়ার উপর নির্ভর ক'রেই স্বাধীন থাকব। অর্থাৎ
যতদিন তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর আঘাতে না দেব,
এবং তাদের সব বকম অর্থনৈতিক সুবিধা ক'রে দেব ততদিন
আমরা স্বাধীন থাকব। এ রকম স্বাধীনতায় থাকা—আর
এখনকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে স্বাধীন থাকা একই কথা।

মিত্র-পক্ষ যদি জেতে তা হ'লে আমাদের লাভ কি ?
মিত্র-পক্ষ জেতা মানে যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের জেতা তা
নয়। মিত্র-পক্ষ জেতা মানে চীনদের যুদ্ধে জেতা, রুশিয়ার
যুদ্ধে জেতা, এবং সমস্ত ইউরোপে, চীনে ও জাপানে বিপ্লবের
জয় এবং পুঁজিবাদী প্রথাব ধ্বংসের সূচনা। গোটা ইউরোপ
এবং চীনে যদি পুঁজিবাদী প্রথা ধ্বংস হ'য়ে যায় তবে সে
বিপ্লবের ধাক্কায ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের পতন অনিবার্য। এবং
এর ফলে আমাদের স্বাধীনতাও অনিবার্য। আসলে মিত্র-
পক্ষের জেতা মানে - মিত্র-পক্ষের জনগণের জেতা—তাদের
বুর্জোয়াদের জেতা নয়, এটা বুঝতে হবে। কারণ সব দেশেই
বুর্জোয়াদের তো হিটলারই বন্ধু—তার পরাজয়ে তারা
দুর্বল হয়।

যদিও বর্তমান যুদ্ধের স্বরূপ এই রকমভাবে দেখলে বুঝতে
মোটেই কষ্ট হয় না, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের পক্ষে

এই বকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা খুব কষ্টকর। তাবা শুধু আমাদের দেশ এবং আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা দেখেই বিচার ক'রে থাকে। “আমাদের দেশ বর্তমানে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদীরা শাসন ক'রছে। এবং সেই অসমর্থ শাসন-ব্যবস্থার ফলে দেশের লোকের জীবন আজ অত্যন্ত দুর্দশা-গ্রস্ত। তাবা সহজভাবে ভাবে—‘মিত্র-পক্ষের জয়’ মানে এই অযোগ্য শাসকদের জয় এবং তার ফলে জনগণের দুঃখের আবও বৃদ্ধি, সুতরাং মিত্র-পক্ষের পবাজয় হওয়াই উচিত। কাবণ তা হ'লে বর্তমান শাসকদের হাত থেকে অন্ততঃ রেহাই পাওয়া যাবে। তারপরে জাপান আসে কিনা তার ঠিক নেই, আব যদিও বা আসে তা হ'লে এত খাবাপ হয়ত তাবা হ'বে না। আব যদি হয়ও তা হ'লে আমাদের দুঃখ যা আছে তার চাইতে আর বাড়বে কি।”—আমাদের দেশের অনেক লোকই এই রকমভাবে বর্তমান যুদ্ধটাকে দেখে থাকে। বর্তমান যুদ্ধে যদিও সাম্রাজ্য রক্ষার জন্তই ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদীরা রুশিয়া ও চীনাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়ছে, কিন্তু এই যুদ্ধের ভেতর দিয়েই সাম্রাজ্যবাদীদের “রক্ষা-প্রাচীর” ফ্যাসিজম্ ধ্বংস হ'চ্ছে আর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের চাইতেও অনেক বেশী শক্তিশালী এক শক্তি উঠছে এবং ধীরে ধীরে তা সাম্রাজ্যবাদী-প্রথাব গোড়ার ভিত্তি পুঁজিবাদী প্রথাকে ধ্বংস ক'রে দিচ্ছে, এই সব লক্ষণ আমরা এখনও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি না। সে শক্তি হচ্ছে সমস্ত

ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বিরাট জন-জাগরণ। এ কথা লেখা হ'য়েছিল ১৯৪১ সালের প্রথম দিকে। এই কয় মাসের ভেতর ফ্যাসিষ্টদের পরাজয়ের ভেতর দিয়ে সমগ্র ইউরোপে জন-জাগরণ এতদূর এগিয়ে গেছে যে আজকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে সমাজ-তান্ত্রিক বাহ্যেব দিকে ইউরোপীয় দেশগুলির অগ্রগতি সকলের কাছেই খুব স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। একমাত্র ব্রিটিশ-বিরোধ যেখানে দেশ-সেবকদের পূঁজি সেখানে অবশ্য এর উল্টো রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমরা ব্রিটিশ-বিরোধী হ'তে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঠিক যুদ্ধ-কৌশলও ভুলে যাই। সাম্রাজ্যবাদ, পূঁজিবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদ সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবই এইকণ সীমাবদ্ধ দৃষ্টির কারণ। সে যাই হোক না কেন, তোমরা যদি পূঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার গোড়ার নিয়মগুলো বুঝে থাক তা হ'লে ফ্যাসিষ্টদের পরাজয়ের ভেতর দিয়েই যে সমস্ত পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এগিয়ে আসবে এবং সমস্ত দেশের জনগণের স্বাধীনতা অনিবার্য হ'য়ে পড়বে তা বুঝতে কষ্ট হ'বে না এবং ভারতবর্ষও যে এই স্বাধীনতার নামে এগিয়ে যেতে পারবে তাও বুঝতে পারবে।

আজ আমাদের জীবনে সর্বগ্রাসী বৃদ্ধি বড় কথা। এই বৃদ্ধি আকাশ হইতে পড়ে নাই, বিধাতার খেয়ালে অথবা কোন বিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির আকস্মিক ক্ষমতা-লিপ্সার উহার উৎপত্তি নহে, উহা মানুষের বা জাতির অভাবজ প্রবৃত্তিও নহে। উহার পশ্চাতে যে নিগূঢ় সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ রহিয়াছে, তাহাই বিনা আড়ম্বরে অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় কিশোর কিশোরীকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার মনে হয়, বাহাদের জন্য বইখানি লেখা, তাহাদের বাপ-দাদা খুড়োরাও যদি এই ছোট বইখানির পাতাগুলি উন্টাইবা দেখেন, তবে তাহা একেবারে পণ্ডিত্রম হয় না।

অরুণি

১৩ই কার্তিক, ১৩৪২।

অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা—বাহার সাহায্যে রাজনীতির মোটামুটি কথাগুলি জানিতে পারে, বাজলা ভাষায় এইরূপ একখানা বইয়ের খুবই অভাব ছিল। লেখকের আলোচ্য গ্রন্থখানা সে অভাব পূরণ করিবে। লেখক রাজনীতির জটিল বিষয়গুলি এত সহজ ও সরলভাবে বিবৃত করিয়াছেন যে, ছেলেমেয়েরা একটু চেষ্টা করিলেই উহা বুঝিতে পারিবে এবং আধুনিক রাজনীতির মূল বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচয় লাভ করিতে পারিবে। শুধু অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা নহে, অনেক বয়স্ক লোকও এ বইখানা পড়িলে উপকৃত হইবেন।

আনন্দ বাজার পত্রিকা

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৫৩।

